স্বস্তিকা

দাম : দশ টাকা

৬৬ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা।। ১৪ এপ্রিল - ২০১৪।। ৩০ চৈত্র - ১৪২০।। নববর্ষ সংখ্যা।। website : www.eswastika.com

শক্ত ভারত, সমৃদ্ধ ভারত

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৭

একটি বিশেষ নববর্ষ ▯ তথাগত রায় ▯ ৮

সমৃদ্ধ ভারত : কেন্দ্র ও রাজ্যের অধিকার এবং সম্পর্ক ▯ রণজিৎ রায় ▯ ৯

জাতীয় সুশাসন ও বিকাশের অভিমুখ ▯ ড: প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় ▯ ১১

শক্তি, সঞ্চয়, সামর্থ্য ও ভারতের প্রতিরক্ষা ▯ মেঃ জেঃ কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (আবসরপ্রাপ্ত) ▯ ১৫

ধর্মনিরপেক্ষতা ও তোষণনীতি ▯ অমিতাভ ঘোষ ▯ ১৯

'আগমার্কা' সেকুলার সাজতে কংগ্রেসী চক্রান্তের ব্যাপকতা ▯ দেবীপ্রসাদ রায় ▯ ২৩

সমৃদ্ধ ভারত : গ্রাম বিকাশ— একটি ভাবনা ▯ রবীন্দ্রনাথ পতি ▯ ২৭

শক্ত ভারত, সমৃদ্ধ ভারত : ভারতের ভবিষ্যৎ বিদেশনীতি ▯ ড: বেদপ্রতাপ বৈদিক ▯ ৩৩

মোদীর বক্তৃতার সম্মোহন হিন্দুর হকের পাওনা, গুজরাটের উন্নয়ন আর বিরোধীদের ভুলগুলিকে চিহ্নিত করে দেওয়ারই সমাহার ▯ চেতন ভগত ▯ ৩৫

শক্ত ভারত ও স্থায়ী সরকার : বিজেপি ও জোট রাজনীতির নতুন অধ্যায় ▯ অম্লানকুসুম ঘোষ ▯ ৩৯

খোলা চিঠি : বরখাস্ত হোক সাম্প্রদায়িক বিজেপি অথবা.... ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৪৩

'ততো জয় মুদীরয়েৎ' ▯ শ্রী চৈতন্য বর্ধন ▯ ৪৫

সংস্কার ভারতীর সাংস্কৃতিক দেওয়ালপঞ্জী : বাংলার দেবদেউল ▯ বিকাশ ভট্টাচার্য ▯ ৪৬

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৬ বর্ষ ৩১ সংখ্যা, ৩০ চৈত্র, ১৪২০ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৫, ১৪ এপ্রিল - ২০১৪

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬

৮৬৯৭৫২১৪৭৯

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪,

৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সমৃদ্ধ ভারতের সন্ধানে

'বৃহদারণ্যক' উপনিষদে ঋষি জনক মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'সূর্য অস্ত গিয়াছে। নাই চন্দ্রিমাও—এই ঘোর অন্ধকারে আমরা আলো কোথায় পাইব?' মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য উত্তরে মাত্র দুইটি বাক্য বলিয়াছিলেন, 'আত্মার জাগরণ ও চেতনার উন্মেষ।' একমাত্র চেতনার উন্মেষই মানুষকে বড় পথের দিকে লইয়া যায়। অন্ধকারের মধ্যে আলোর সন্ধান দিতে পারে একমাত্র জীবনদর্শন। দেশ আজ আর এক সন্ধিক্ষণে—নির্বাচন আসন্ন। দশ বছরের অন্ধকারকে পিছনে ফেলিয়া শক্ত ভারত, সমৃদ্ধ ভারত গঠনে আমরা অনুসন্ধানরত। আজও সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্-এর প্রতীক্ষায় অপেক্ষারত মানুষ। বিগত সময়ের ন্যায় যাজ্ঞবল্ক্যের মতোই আজও আলোর সন্ধানের ইঙ্গিত করিয়াছেন অন্য এক পথপ্রদর্শক—তিনি নরেন্দ্র মোদী। আমরা অনেকেই হাসাহাসি করিতে পারি, সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী বলিয়া গাল পাড়িতে পারি। কিন্তু উন্নয়নের যে যাদুতে তিনি মানুষকে সম্মোহিত করিতেছেন, নানান স্বপ্ন দেখাইতেছেন সেগুলি বাস্তবে ঠিক কি তাহা জানিবার প্রয়োজন।

সমৃদ্ধ ভারত যোগাযোগ ব্যবস্থা-বিহীন অসম্পূর্ণ। এনডিএ আমলে অটলবিহারী বাজপেয়ীর সোনালী চতুর্ভুজ পরিকল্পনায় গতিশীল সড়ক আর ঘরে ঘরে মোবাইল-এ যাহার সূচনা। সেদিন যদিও ইন্ডিয়া সাইনিংকে আমরা নির্মম ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম অথচ তাহার সুফল ভোগ করিতে আমাদের এতটুকুও লজ্জা নাই। আজ মোদী স্বপ্ন দেখাইতেছেন দেশের চার প্রান্তে শহরগুলির মধ্যে কম সময়ে যাতায়াত করিবার জন্য প্রয়োজন বুলেট ট্রেন। আজ জীবিকার সন্ধানে গ্রাম হইতে শহরগুলিতে আসা মানুষের চাপে বহু শহরেরই নাভিশ্বাস অবস্থা। সেইজন্য ১০০টি সর্বাধুনিক সুবিধাযুক্ত শহর গড়িয়া তুলিবার পরিকল্পনা রহিয়াছে তাঁহার। এগুলি হইবে পরিবেশ বান্ধব ও বস্তিশূন্য। নূতন ও উন্নত রাস্তা, হাইওয়ে, বিমানবন্দর তৈরি করিবার পাশাপাশি বন্ধ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি খুলিতে হইবে। উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত হিসেবে এইগুলির গুরুত্বও কিন্তু অপরিসীম। তাঁহার মতে সারাবিশ্বের কাছে—ট্রাডিশন, ট্যালেন্ট, টেকনোলজি, ট্যুরিজিম ও ট্রেড-এর মাধ্যমে আমাদের দেশের অগাধ ঐশ্বর্যগুলিকে তুলিয়া ধরিতে হইবে। কারণ ইহার কারণেই বিনিয়োগকারীরা সরাসরি আকৃষ্ট হইবে। কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের ক্ষেত্রে চাষীদের সর্বাধুনিক টেকনোলজির সাহায্য দিবার প্রয়োজন। সেল ফোনে কৃষিপণ্যের সর্বোচ্চ মূল্য ও তাহার সর্বশেষ দর সম্বন্ধে চাষীকে ধারণা দিতে পারিলে ফড়েদের অত্যাচার কমানো যাইবে। দিল্লীতে এক বাণিজ্যসভায় মোদী বলিয়াছেন, অনলাইন ব্যবসার রমরমা মানেই খুচরো ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন এমন ভাবিবার কোনও কারণ নাই। গ্রামের মানুষও এখন ব্রান্ডেড জিনিসপত্র ব্যবহার করেন। এই দেশে দ্রব্যের গুণগত মান ও ডেলিভারি ব্যবস্থা উন্নত করিয়া বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা সম্ভব। উল্লেখ্য, আমাদের দেশে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার পরিবর্তে বিনিয়োগকারীদের জন্য সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেম তৈরির কথা মোদীর পূর্বে অন্য কেহ ভাবেন নাই। তাঁহার রাজ্যে কেবলমাত্র শিল্পস্থাপন নয়, বিনিয়োগকারীদের সহিত শুধুমাত্র শিল্প সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করেন নাই। শিল্পায়ণের প্রতিটি পর্বে আর্থিক ও নীতিগত স্বচ্ছতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন তিনি। মূল্যস্তর নিয়ন্ত্রণে একটি সর্বভারতীয় মূল্য স্থিতিকরণ তহবিল গঠন করিলে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। বাজারে পণ্যের সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিলে এই তহবিল হইতে টাকা লইয়া বাজারদরের বৃদ্ধি ঠেকানো যাইবে। যদিও সমালোচকরা বলিতে পারেন, বাজারে ন্যূনতম সহায়কমূল্যে সরকারের কৃষিপণ্য ক্রয় করিবার পদ্ধতি তো চালু রহিয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন রহিয়াছে পরিকাঠামো ও তাহার পদ্ধতিগত ত্রুটি এবং সুশাসনের। এদেশে অনেক কিছুই তো রহিয়াছে কিন্তু তবুও জনতার দুর্দশার অন্ত নাই। মজুতদারদের কঠোর শাস্তি মুখে নয়—কাজেও দেখাইতে হইবে।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও নতুন আলোর সন্ধান দিয়াছেন মোদী। তাঁহার পরিকল্পনায় ১৩টি নতুন আই আই টি, ১৫টি আই আই এম ইত্যাদি স্থাপনের প্রসঙ্গ রহিয়াছে। সমৃদ্ধ ভারত গঠনের চিন্তাভাবনা বহু নেতাই হয়তো করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রত্যাশা পূরণ করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প একমাত্র মোদীই দেখাইতে পারিয়াছেন। একমাত্র মোদীই বলিয়াছেন, আমাদের দেশে দুর্নীতি রহিয়াছে, কাজে ফাঁকি দিবার লোক থাকিবে, কাজ পণ্ড করিবার লোকেরও অভাব হইবে না। কিন্তু এই সিস্টেমের মধ্যে থাকিয়াও কেবল সুশাসন, সততা ও সদিচ্ছা থাকিলে কাজ করা সম্ভব।

সুভাষিত

প্রজাসুখে সুখং রাজ্ঞঃ প্রজানাং চ হিতে হিতম্।
নাত্মপ্রিয়ং হিতং রাজ্ঞঃ প্রজানাং তু প্রিয়ং হিতম্।।

আদর্শ রাজা তিনিই যিনি প্রজার সুখে সুখ এবং প্রজার মঙ্গলেই নিজের মঙ্গল এবং নিজস্ব পছন্দ অপছন্দের চেয়ে প্রজার যা ভালো লাগে সেটাই নিজের জন্য মঙ্গলকারক বলে মনে করেন।

একটি বিশেষ নববর্ষ

তথাগত রায়

১৪২১ বঙ্গাব্দের যে সূচনা আমরা দেখতে চলেছি তা কোনো সাধারণ নববর্ষ নয়। এই নববর্ষ ভারতের ইতিহাসে একটা মাইলফলক হতে পারে, জলবিভাজিকা হতে পারে, একটা নতুন যুগের সূচনা পর্যন্ত করতে পারে। এই নববর্ষের অব্যবহিত পরে যে সাধারণ নির্বাচন আসছে তাতে অনেক ইন্দ্রপতন হবার সম্ভাবনা যেমনি আছে তেমনি একটা অসাধারণ পরিবর্তনের ইঙ্গিতও আছে। এই পরিবর্তন শুধু রাজনীতিকে ঘিরে নয়, সারা ভারতের চিন্তা, ভাবনা, মূল্যবোধ ঘিরে হতে পারে— এমন সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

কিসের জোরে এত বড় বড় কথা বলছি। এই জোরে বলছি, যে আগামী দিনে ভারতের জনসাধারণ সম্ভবত যে মানুষটিকে ক্ষমতায় আনবেন তিনি এই রকম আমূল পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখেন। এই মানুষটি নিজের অত্যন্ত দীনহীন অবস্থা থেকে এমনি এমনি উঠে আসেননি। একাদিক্রমে নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, রাজনৈতিক কৌশল, লক্ষ্যে স্থিরতা এবং সর্বোপরি যে মহান প্রতিষ্ঠানের তিনি অঙ্গ সেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আদর্শে অবিচল আস্থাই নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীকে এখানে এনেছে। আপনাআপনি হয়নি, তাঁর দলের এবং দলের প্রেরণার উৎস সঙ্ঘের বিচক্ষণতার ফলে, তাঁকে বেছে নেবার ফলেই এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে।

অনেকে বলবেন, নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হবেন ঠিকই, কিন্তু কোনো যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে পারবেন না, কারণ ওই ধরনের যুগান্তর ভারতের ইতিহাসের সঙ্গে খাপ খায় না। এটা আংশিক সত্য— আমরা ভারতের ইতিহাসে প্রায় সব সময়েই মৃদু আলোড়ন দেখেছি, যেন একটা ছবি মিলিয়ে যাচ্ছে, আর তার জায়গায় আর একটা ছবি পরিস্ফুট হচ্ছে, যাকে সিনেমার পরিভাষায় বলে ‘ফেড-ইন, ফেড-আউট’। কিন্তু যুগান্তরও দেখেছি। ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ, ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা, দেশভাগ ও দাঙ্গা, এগুলি এমনি যুগান্তর। অতএব তেমনি যুগান্তর আবার আসতে পারে না, একথা ভাবা ঠিক নয়।

এই সব প্রত্যাশা যদি সঠিক প্রমাণিত হয় তা হলে আমরা আমাদের অভীষ্ট পরম বৈভবের দিকে এগিয়ে যাব। ধর্মে ধর্মে দাঙ্গা অতীতের ইতিহাস হয়ে যাবে। জাতপাতের লড়াই মানুষ ভুলে যাবে, এগুলিকে আধার করে যারা রাজনীতি করে তাদেরকে মানুষ ছুঁড়ে ফেলে দেবে। ভারত এক সমৃদ্ধিশালী মহাশক্তিধর সদ্ধর্মনিষ্ঠ দেশে পরিণত হবে। আসুন, আমরা সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করি, যে নরেন্দ্র মোদীকে আমরা ক্ষমতায় আনতে চলেছি তিনি যেন আমাদের সেই পরম বৈভবের জায়গায় পৌঁছে দেন।

প্রকাশিত হবে
২১ এপ্রিল
২০১৪

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২১ এপ্রিল
২০১৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

গুজরাট মডেল

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলছেন গুজরাটের থেকেও নাকি পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন বেশি, গুজরাট মডেল বলে কিছু হয় না। কিন্তু বাস্তবে সারা ভারতেই জনপ্রিয় মোদীর গুজরাট মডেল। অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরা এই মডেলের প্রশংসায় উচ্চকণ্ঠ। কিন্তু গুজরাট মডেল কি এবং ভারত সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই মডেলের উপকারিতা নিয়েই আগামী সংখ্যার বিশেষ বিষয়—গুজরাট মডেল। লিখেছেন—সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

দাম একই থাকছে— ১০ টাকা।

সমৃদ্ধ ভারত

কেন্দ্র ও রাজ্যের অধিকার এবং সম্পর্ক

রণজিৎ রায়

এবার লোকসভার ভোটে মুখ্য ভূমিকা নিতে পারে দেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক দলগুলি। সংবাদপত্রে প্রকাশিত জনমত সমীক্ষায় এমনটিই বলা হয়েছে। জাতীয় দল নয় কেন? এই ছোট্ট প্রশ্নটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্ক। কারণ, আঞ্চলিক দলগুলির উত্থানের পিছনে আছে কেন্দ্রের দাদাগিরির নীতি। আর এই নীতির জন্মদাতা কংগ্রেস। সেই নেহরুর আমল থেকে আজ পর্যন্ত কেন্দ্রে শাসন ক্ষমতায় থাকা কংগ্রেস শাসকরা নিজেদের লালকেল্লার মুঘল সম্রাট বলে মনে করেছেন। কংগ্রেস নেতারা সকলেই দেশের রাজ্যগুলিকে দিল্লীর অধীনস্থ করদ রাজ্য বলে বিশ্বাস করতেন। পঞ্চাশের দশকে নেহরুর আমলে কেন্দ্রের দাদাগিরি শাসন চলাকালে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে বিতর্ক ওঠেনি। তার কারণ, ভারতের প্রায় সব রাজ্যেই তখন কংগ্রেসরই নিরঙ্কুশ আধিপত্য ছিল। নেহরুর মৃত্যুর পর কংগ্রেস দলে ভাঙন ধরে। দল দুটি ভাগে বিভক্ত হয়। সিন্ডিকেট কংগ্রেস এবং ইন্দিরা কংগ্রেস। দেশের প্রবীণ ও প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতারা ছিলেন সিন্ডিকেট কংগ্রেসে। তাঁরাই দলের প্রতীক নিজেদের দখলে রাখেন। ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে ছিলেন দলের তরুণ কংগ্রেসীরা। যতদূর মনে আছে, ১৯৬৭ সালে ইন্দিরা কংগ্রেস দলের মধ্যে ক্ষমতা দখল করে সিন্ডিকেট কংগ্রেসীদের বনবাসে পাঠিয়ে দেয়। এই সময়েই ইন্দিরার ফতোয়ায় দেশের সাতটি রাজ্যের বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হয়। জারি করা হয় রাষ্ট্রপতির শাসন। অথচ এই সাতটি রাজ্যেই বিধানসভায় শাসকদলের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। রাজ্য সরকারগুলির স্থায়িত্ব নিয়েও প্রশ্ন ছিল না। তবু কেন্দ্রের নির্দেশে সরকার ভেঙে দেওয়া হয়। শুরু হয় কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা এবং অধিকার নিয়ে তুমুল বিতর্ক। পরস্পরের সাংবিধানিক অধিকার নিয়ে একাধিক মামলা দায়ের করা হয় দেশের শীর্ষ আদালতের কনস্টিটিউসন বেঞ্চে। শুরু হয়ে যায় রাজনৈতিক তরজা। কিন্তু এর অনেক আগেই প্রাক্তন ভারতীয় জনসঙ্ঘের নেতৃত্ব চেয়েছিলেন কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের একটি নির্দিষ্ট রূপরেখা সংসদে স্থির করা হোক। ১৯৫১ সালের ২৯ অক্টোবরে জনসঙ্ঘ তার প্রথম দলীয় ইস্তাহার প্রকাশ করে বলে যে, জাতীয় সংহতি রক্ষার স্বার্থে রাজ্যগুলিকে আরও বেশি আর্থিক ও প্রশাসনিক অধিকার দিতে হবে। 'আমরা চাই শক্তিশালী কেন্দ্র এবং শক্তিশালী রাজ্য।' দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে জনসঙ্ঘের রাজনৈতিক ইস্তাহার যথেষ্ট আধুনিক ও মননশীল হওয়া সত্ত্বেও দেশের হিন্দি বলয়ের বাইরে অন্য রাজ্যগুলির কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। জনসঙ্ঘের ইস্তাহারে রাষ্ট্রভাষা হিন্দিকে শিক্ষাক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব ছিল। বক্তব্য ছিল, 'ওয়ান নেশন, ওয়ান কালচার এবং ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ'। অহিন্দিভাষী রাজ্যগুলি, বিশেষত দক্ষিণের, প্রবল আপত্তি জানায়। ভাষা বিতর্কটাই তখন এতটা জোরদার হয়েছিল যে কেন্দ্র-রাজ্য অধিকারের প্রশ্নটি চাপা পড়ে যায়।

পরবর্তীকালে ভারতীয় জনসঙ্ঘ পরিচিত হয় ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) নামে। বিজেপি নেতাদের অধিকাংশই ছিলেন সাবেক জনসঙ্ঘ দলে। ১৯৮৩ সালে শ্রীনগরে অনুষ্ঠিত 'কনক্লেভে' বিজেপি কেন্দ্র ও রাজ্যের অধিকার এবং সম্পর্ক নিয়ে জাতীয় নীতি ঘোষণা করার দাবি জানায়। শ্রীনগরের কনক্লেভে গৃহীত প্রস্তাবে স্পষ্ট বলা হয় জাতীয় স্তরে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক 'ইন্টার স্টেট কাউন্সিল' গঠন করতে হবে। যুক্তি দেখানো হয়, ভারতীয় সংবিধানের ২৬৩নং অনুচ্ছেদে এই জাতীয় ইন্টার স্টেট কাউন্সিলের কথা বলা হয়েছে। বিজেপির এই প্রস্তাবের রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল কংগ্রেসের পেটোয়া রাজ্যপালদের ক্ষমতা খর্ব করা। কেন্দ্রে তখন ক্ষমতায় ফিরেছেন ইন্দিরা গান্ধী। তাঁর মাথায় তখন একটাই চিন্তা। যেসব

> **কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কটা ঠিক কেমন হওয়া উচিত নির্বাচনী ভাষণে নরেন্দ্রভাই মোদী স্বয়ং একাধিকবার বলেছেন। উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যূনতম হস্তক্ষেপ ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা হবে সহায়তাকারীর। নিয়ন্ত্রকের নয়। রাজ্যের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প কেন্দ্র বেঁধে দেবে না।**

রাজ্যে কংগ্রেস-বিরোধী শাসক দল আছে তাদের শায়েস্তা করা। বিজেপি নেতৃত্ব এই সহজ সরল কথাটি সবার আগে বুঝেছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী সংবিধানের ৩৫৬ ধারার অপপ্রয়োগ করে কংগ্রেস-বিরোধী রাজ্য সরকারগুলিকে যাতে ফেলে দিতে না পারেন সেই কারণেই বিজেপি কেন্দ্র ও রাজ্যের অধিকারের সাংবিধানিক রক্ষা কবচ প্রস্তাবিত কাউন্সিলের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিল। কাউন্সিলের সুপারিশ ও সম্মতি ছাড়া কোনও রাজ্যেই কেন্দ্র রাষ্ট্রপতির শাসন বলবৎ করতে পারবে না। স্বাভাবিকভাবেই ইন্দিরার কেন্দ্রীয় সরকার সেই প্রস্তাব খারিজ করে দেয়। বিজেপি-র প্রস্তাব বাতিল করলেও বিরোধীদের, বিশেষত বামপন্থীদের লাগাতার আন্দোলনের চাপে ১৯৮৩ সালেই কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য সারকারিয়া কমিশন গঠন করতে বাধ্য হয়। কমিশনের কাছে জমা দেওয়া বিজেপি-র লিখিত প্রস্তাবে বলা হয় যে কেন্দ্রীয় অর্থ-বরাদ্দের ক্ষেত্রে কংগ্রেস-বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলিকে লাগাতার বঞ্চনা করা বন্ধ করতে হবে। কেন্দ্রীয় যোজনা কমিশনকে স্বশাসিত স্বাধীন সংস্থার মর্যাদা দিতে হবে। যোজনা কমিশন তার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া সম্পর্কে মতামত নিতে পারে একমাত্র ন্যাশান্যাল ডেভেলাপমেন্ট কাউন্সিলের। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক অথবা স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও কোনওভাবেই প্ল্যানিং কমিশনের মাথার উপর ছড়ি ঘোরাতে পারবেন না। রাজ্যগুলির উন্নয়নের নিজস্ব চাহিদা অনুসারে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। বিজেপি স্পষ্টভাবে বলেছিল কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলির আশা, আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনকে পাত্তা না দেওয়াই দেশজুড়ে আঞ্চলিক দলের প্রাধান্য ও শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছে। ১৯৮৩ সালে বিজেপি-র এই সতর্কবাণী উপেক্ষা করার বিষময় ফলেই আজ দেশজুড়ে আঞ্চলিক দলগুলির রমরমা। বহুভাষী এই দেশকে এক সূত্রে বেঁধে রাখতে গেলে প্রয়োজন জাতীয় সংকল্পবদ্ধ দলের। ছোট ছোট আঞ্চলিক দলগুলি ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বপ্ন দেখে না। তারা নিজ নিজ রাজ্যের স্বার্থে সংকীর্ণ রাজনীতি করে। তাই লালু যাদব, নীতীশ কুমার, মমতা ব্যানার্জিরা যখনই রেলমন্ত্রী হয়েছেন তখন তাঁরা রাজ্যেরই স্বার্থ দেখেছেন। আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের রেলমন্ত্রীরা ভুলে যান যে ভারতীয় রেলপথই সারা দেশকে এক সূত্রে বেঁধেছে। প্রাক্তন বিজেপি প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারীবাজপেয়ীর আমলের সোনালী জাতীয় সড়ক যোজনা রূপায়ণের সময় বিজেপি বা এন ডি এ বিরোধী রাজ্যগুলিকে বঞ্চিত করা হয়নি। কেন্দ্রের বঞ্চনার অভিযোগ বার বার উঠেছে শুধুমাত্র কেন্দ্রে কংগ্রেসের শাসনকালেই।

কেন্দ্র কংগ্রেস সরকারের আর্থিক বঞ্চনার জন্যই আঞ্চলিক দলের জন্ম, বৃদ্ধি এবং রমরমা। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীরা ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রাজ্যজুড়ে দেওয়াল লেখায় সিপিএম প্রচার করতো ‘কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণের জন্যই পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে পড়ছে।’ সিপিএম শাসকরা নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে কাথায় কথায় কেন্দ্রের বঞ্চনার কথা বলে মানুষের নজর ঘোরাতেন। তখন সবাই ভাবতেন কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীই বাঙালির বিমাতা। অথবা পশ্চিমবঙ্গবাসীরা ইন্দিরার জারজ সন্তান। অথচ তলে তলে ইন্দিরার সঙ্গে প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ‘সখা’ সম্পর্কটি পুরোমাত্রায় বজায় ছিল। সারকারিয়া কমিশনে সিপিএম ‘বিকল্প তৃতীয় অর্থনীতির সূত্র’ জমা দিয়ে নিজেরাই নিজেদের পিঠ চাপড়ে ছিল। যেমন, রাজ্যের প্রাক্তন সিপিএম অর্থমন্ত্রী অসীম দাসগুপ্তমশাই বিধানসভায় প্রতিবার তাঁর ঘাটতি বাজেটকে শূন্য ঘাটতি বাজেট বলে চালিয়ে দিতেন। বাঙালিরা সাধারণভাবে হুজুগ প্রিয় জাতি। সহজেই বোকা বানানো যায়। সিপিএম ৩৫ বছর বাঙালিকে ভেড়া বানিয়ে রেখেছিল। এখন মমতা বোকা বানাচ্ছেন। যেমন, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামেগঞ্জে উন্নয়নের জোয়ার বইছে। রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে উচ্চমাধ্যমিক স্কুল কলেজ তিনি চালু করে দিয়েছেন। প্রতিটি জেলায় একটি করে বিশ্ববিদ্যালয়, সুপার স্পেশালিটি সরকারি হাসপাতাল গড়ে দিয়েছেন। বাস্তবে সেসব কেউ চোখে দেখছেন না। তবু তা সত্য বলে মেনে নিচ্ছেন। এই রাজ্যে গত ২ বছরে একটিও বড় শিল্পসংস্থা বিনিয়োগ করতে আসেনি। কিন্তু দিদি বলছেন, রাজ্যে শিল্পোন্নয়নের ঝড় বইছে। বাঙালি বিশ্বাস করছে। বিশ্বাস না করলে অবশ্যই আওয়াজ উঠতো, মিথ্যাবাদী নারী নির্যাতনকারী তৃণমূলকে একটি ভোটও দেবেন না। দিদি প্রতিটি জনসভায় অবাধে বলছেন, দাঙ্গাবাজ বিজেপিকে একটি ভোটও দেবেন না। একদা সিপিএমের লেজুড় এবং এখন লাল জামা পালটে সবুজ পাঞ্জাবি পরা মিঠুন চক্রবর্তী ভাষণ দিচ্ছেন রাজ্যের ৪২টি লোকসভা আসন জিতে মমতাই দেশের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। বাঙালি এমন মিথ্যাও খাচ্ছে। আনন্দে হাততালি দিচ্ছে।

কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কটা ঠিক কেমন হওয়া উচিত নির্বাচনী ভাষণে নরেন্দ্রভাই মোদী স্বয়ং একাধিকবার বলেছেন। উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যূনতম হস্তক্ষেপ ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা হবে সহায়তাকারীর। নিয়ন্ত্রকের নয়। রাজ্যের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প কেন্দ্র বেঁধে দেবে না। সেই প্রকল্প তৈরি করবে রাজ্য সরকার তার নিজস্ব প্রয়োজন মতো। কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দের সুযোগ সমানভাবে পাবে সব রাজ্য। নরেন্দ্রভাই বলেছেন, দেশের সব আঞ্চলিক দলের সহযোগিতা তিনি চান। নতুন ভারত গড়তে সকলকেই প্রয়োজন। কেন্দ্র-রাজ্য সম মর্যাদায় দেশ গড়বে। আঞ্চলিক দল তাদের অঞ্চলের উন্নয়ন চায়। কেন্দ্র সারাদেশের উন্নয়ন চায়। সুতরাং বিরোধটা কোথায়? রাজ্যগুলির উন্নয়ন হলে কেন্দ্র শক্তিশালী হবে। এতকাল ঝগড়াটা ছিল বা এখনও আছে তার কারণ আজও দিল্লীর সরকার ঠিক করে দেয় কোন রাজ্যে উন্নয়ন প্রকল্পটি কী হবে। এটা কেন হবে? রাজ্য প্রস্তাব দেবে তার কী ধরনের প্রকল্প দরকার। তার প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের দায়িত্বটা কেন্দ্রের। শুধু কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ঠিকভাবে খরচ হচ্ছে কিনা তার নজরদারি করবে কেন্দ্রীয় সরকার।

(লেখক একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলকাতা প্রেসক্লাবের প্রাক্তন সম্পাদক)

জাতীয় সুশাসন ও বিকাশের অভিমুখ

ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

১৯১৪ সালে একশো বছর আগে বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনা হয়। উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিণতি ছিল এই মহাযুদ্ধ। জাতীয় স্বার্থের সংঘাতে মহাপ্রলয় ঘটেছিল। ইউরোপের আগ্রাসী জাতীয়তাবাদের বিপরীতে ছিল ভারতের পরাধীনতা। কিন্তু

ভারতের এমন অবস্থা কেন? এই বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বাধীনতা ও জাতিপ্রতিষ্ঠা এই দুটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। 'ভারত কলঙ্ক', 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা' ও 'বাঙালির বাহুবল'— এই তিনটি রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন স্বাধীনতা ও জাতি প্রতিষ্ঠা দুইয়ের জন্যই 'বাহুবল' প্রয়োজন। কিন্তু বঙ্কিমের মতে নিছক শারীরিক বলকে বাহুবল বলা যায় না, এর জন্য প্রয়োজন জাতির উদ্যম, ঐক্য, সাহস ও অধ্যবসায়। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনার প্রতিধ্বনি শুনি বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের রচনায়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অনুশীলন থেকে সরে এসে ভারতীয়রা নিজেদের সর্বনাশ করেছিল। স্বামীজী লিখেছেন, গোলাবারুদের ব্যবহার আয়ত্ত করেই বহিরাগত মুসলমানরা জয়যুক্ত হয়েছিল। আবার নৌশক্তি ও সমরনৈপুণ্যের জন্য ইউরোপীয় দেশগুলি উপনিবেশ স্থাপনে সক্ষম হয়। বৃটিশ শাসনে আবার আর একটি নেতিবাচক দিক ফুটে ওঠে। সামাজিক ব্যবধান ও ধর্মীয় বিভেদকে পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগিয়ে বৃটিশ শাসনকে কৌশলে টিকিয়ে রাখার পথ গ্রহণ করে। বিদেশী শাসন ও

বিদেশী শাসন ও জাতীয় তামসের অবসানের জন্য শ্রীঅরবিন্দ ক্ষত্রিয় রণনীতিকে একমাত্র পথ ও পন্থা বলে নির্দেশিত করেছিলেন।....... ভারতের বাইরে লালা হরদয়াল, মহেন্দ্র প্রতাপ, রাসবিহারী বসু, সর্বোপরি নেতাজী সুভাষ সংগ্রামী ধারাকে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দেশের ভেতরে আপোসমুখী প্রবণতা মুক্তি সংগ্রামকে সজীব ও প্রাণবন্ত করে তোলেনি। এর পাশাপাশি জাতপাত ও ধর্মের আবরণে বিভেদপন্থী প্রবণতা মাথাচাড়া দেয়। এরই পরিণতি ১৯৪৭ সালের মধ্যরাতের স্বাধীনতা।

জাতীয় তামসের অবসানের জন্য শ্রীঅরবিন্দ ক্ষত্রিয় রণনীতিকে একমাত্র পথ ও পন্থা বলে নির্দেশিত করেছিলেন।

কিন্তু তামস বিদীর্ণ করার জন্য যে সংগ্রামী রণকৌশল প্রয়োজন, তা সঠিকভাবে জাতীয় সংগ্রামের প্রধান ধারায় পরিণত হয়নি। লোকমান্য তিলক এইক্ষেত্রে

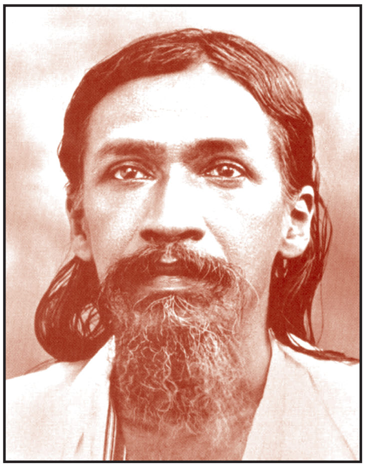

সঠিক দিশা দেখিয়েছিলেন। ভারতীয় আধারে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের স্রোত বিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হয়েছিল। সাভারকর, ভগৎ সিংহ, সূর্য সেন প্রমুখের সংগ্রামী ঐতিহ্য জাতীয় আন্দোলনের প্রধান বিকল্প হয়ে ওঠেনি। ভারতের বাইরে লালা হরদয়াল, মহেন্দ্র প্রতাপ, রাসবিহারী বসু, সর্বোপরি নেতাজী সুভাষ সংগ্রামী ধারাকে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দেশের ভেতরে আপোসমুখী প্রবণতা মুক্তি সংগ্রামকে সজীব ও প্রাণবন্ত করে তোলেনি। এর পাশাপাশি জাতপাত ও ধর্মের আবরণে বিভেদপন্থী প্রবণতা মাথাচাড়া দেয়।

এরই পরিণতি ১৯৪৭ সালের মধ্যরাতের স্বাধীনতা। বোঝাপড়ার মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর ঘটল আর অন্যদিকে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাজনের দুঃখজনক সিদ্ধান্ত বলবৎ হলো।

জাতি নির্মাণের বাধা-বিপত্তি :

স্বাধীনতার পরবর্তী সময় বিষণ্ণ প্রভাতের মত। রক্তস্নাত তমসাচ্ছন্ন পরিবেশে ছিন্নমূল শরণার্থীদের ভিড় জমেছে। এর সঙ্গে ছিল প্রায় পাঁচ শতাধিক দেশীয় রাজ্যের ভারতভুক্তির প্রশ্ন। সৌভাগ্যের কথা, ভারতের প্রথম মন্ত্রিসভা একদলীয় বিষয় ছিল না। সর্দার প্যাটেলের মতো বিচক্ষণ সাহসী নেতা ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আর ছিলেন ডঃ আম্বেদকর, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, জন মাথাই-এর মতো কীর্তিমান মন্ত্রীরা। সর্দার প্যাটেলের সুযোগ্য নেতৃত্বে দ্রুতগতিতে দেশীয় রাজ্যগুলি ভারত ইউনিয়নে যোগ দিল। হায়দরাবাদের নিজামের ভারত-বিরোধী চক্রান্ত ব্যর্থ হলো। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী নেহরুর দোদুল্যমানতায় কাশ্মীর নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হলো, সেই ব্যাধি এখনও অটুট আছে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খাঁর সঙ্গে আপোসমুখী চুক্তি (এপ্রিল ১৯৫০) সম্পাদন করে নেহরু পাকিস্তানের বিপন্ন সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ হলেন। শ্যামাপ্রসাদ মন্ত্রিসভা থেকে বেরিয়ে এলেন। ভারতীয় সংসদে তিনি নেহরুর আপোসমুখী নীতির বিরুদ্ধে সরব হলেন, ইতিবাচক সক্রিয় এমনকী প্রয়োজনে প্রতিরোধমূলক নীতি অনুসরণের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু নেহরুর সাড়া মিলল না। এরপর একের পর এক সাধারণ নির্বাচন হলো, নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস দল নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দখল করল। এর পাশাপাশি পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আয়োজন চলল।

কিন্তু বিশ্ব শান্তির প্রতীক ও পঞ্চশীলের প্রবক্তা নেহরু বিশ্ব রাজনীতি নিয়ে যতটা ব্যস্ত ছিলেন, দেশের ভেতরের ও পরিপার্শ্বের সমস্যা নিয়ে তাঁর ততটা মাথাব্যথা ছিল না। এর ফল কতটা মারাত্মক হতে পারে তা সম্প্রতি প্রকাশিত হেন্ডারসন নথিতে প্রমাণিত। এমনকী দেশের নিরাপত্তা নিয়ে পূর্ব কম্যান্ডের সেনাপতি থোরাট যে পঁচিশ পাতার রিপোর্ট দিয়েছিলেন, তাও তাঁর নজর কাড়েনি। ফলে যা হওয়ায় তাই হলো। চীন ভারত আক্রমণ করলে (১৯৬২) ভারতের সামরিক বিপর্যয় হয়। এদিকে প্রদেশে প্রদেশে কংগ্রেস নেতাদের বাড়বাড়ন্ত শুরু হলো। পরিস্থিতি সামাল দিতে কামরাজ পরিকল্পনা গৃহীত হলো (১৯৬৩ খৃস্টাব্দ)। কিন্তু নেহরুর প্রয়াণের আগে (১৯৬৪ খৃস্টাব্দ) পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি।

শাসন সঙ্কটের প্রকোপ :

১৯৬৭ সালের পর কংগ্রেসের পরিস্থিতিতে অবনতি ঘটল। ১৯৬৯ সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস দুটি বিবাদমান শিবিরে ভাগ হয়ে গেল। ১৯৭১ সালের পর কংগ্রেস দলে কার্যত গণতন্ত্র অপসৃত হলো এবং দলে পরিবারতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো। এখানে শেষ নয়। ১৯৭৫ সালে ভারতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে স্বৈরাচারী শাসন বলবৎ হয়।

ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলে যেমন পরিবারতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের দাপট বৃদ্ধি পেল, অন্যদিকে দেশজুড়ে সুশাসনের পরিবর্তে অপশাসনের মাত্রা বৃদ্ধি পেল। ১৯৭০ সালের পর থেকেই শাসক দলের কর্তারা দুর্নীতির দিকে ঝুঁকলেন। ভারতের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আরও দুটি নেতিবাচক প্রবণতা প্রকট হয়ে উঠল। ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশে সংখ্যালঘু তোষণের চরিত্র প্রকাশ্য রূপ নিল। শাহবানু মামলার রায় নস্যাৎ করে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী মৌলবাদী মুসলিমদের কাছে নতি স্বীকার করলেন। দ্বিতীয়ত, জাতপাতের রাজনীতি ও আঞ্চলিকতাবাদ পরিপুষ্ট হয়ে উঠল। যুক্তফ্রন্ট, ফেডারেল ফ্রন্ট এইসব বুলির আড়ালে ভারতীয় রাজনীতিতে ঘোঁট পাকানোর খেলা শুরু হলো।

একই সঙ্গে ১৯৮০-র দশক থেকে দেশের ভেতরে ও বাইরে বিভিন্ন আবরণে জঙ্গি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ তীব্র আকার ধারণ করে। ইসলামীয় জঙ্গি সন্ত্রাসবাদী মূলত কাশ্মীরে তৎপরতা চালালেও পাশাপাশি ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাদের তাণ্ডব শুরু হয়। মুম্বই-এ ১৯৯৩ সালের মার্চে ও ২০০৮ এর নভেম্বরে পাক-মদতপুষ্ট জঙ্গিরা ব্যাপক নাশকতা চালায়। ভারতের ভেতরে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের সঙ্গে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির যোগসাজস সকলেরই জানা। আর ভারতের ভেতরে মাওবাদী নাশকতার প্রকোপ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রসারিত হয়েছে। উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে মূল সমস্যাগুলি চিহ্নিত করা যায়—

(১) অপশাসন ও দুর্নীতির ব্যাপ্তি (ক্ষমতাসীন দ্বিতীয় ইউপিএ আমলে চরম বহিঃপ্রকাশ)।

(২) জাতীয় কংগ্রেস দলে

সুশাসন ও সার্থক বিকাশের স্বার্থে এমন রাজনৈতিক দলের হাতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হবে যাদের এসব উপকরণ রয়েছে। সঠিক ভাবেই নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি পারিচালিত এনডিএ গুণগত বিচারে অন্যদের চেয়ে দেশের স্বার্থে গ্রহণযোগ্য বিকল্প।

পরিবারতন্ত্রের প্রাধান্য।

(৩) জাতপাতভিত্তিক আঞ্চলিক দলগুলির উপদ্রব।

(৪) ধর্মনিরপেক্ষতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের নামে জাতীয় রাজনীতির ভঙ্গুর দশা।

(৫) সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ফলে সুরক্ষা ও নিরাপত্তার অভাব।

পরিত্রাণের পথ :

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে সব হিসেব নিকেশ সারতে হবে। এ নিছক ভোটের রাজনীতি নয়। অথবা ছলচাতুরীর মাধ্যমে সুযোগ সন্ধানী রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষমতা দখলের বিষয় নয়। এক কথায়, এই নির্বাচন ধর্মযুদ্ধের প্রতিরূপ। দেশ ও দেশবাসীকে বিপথে যারা নিয়ে গেছেন, দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়েছেন তাদের বিচারের দিন আগত প্রায়। এই নির্বাচনে দুটি জাতীয় দলের একটিকে বেছে নিতে হবে, আঞ্চলিক ও বিভাজনপন্থী দলগুলিকে জনগণের রায়ে ঘৃণাভরে বর্জন করতে হবে। অন্য দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দল গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে বর্জন করে পরিবারতন্ত্রের ভজনায় ব্যস্ত। 'ইন্দিরা চাই দেশ বাঁচাও', 'রাজীব চাই দেশ বাঁচাও, 'সোনিয়া লাও দেশ বাঁচাও' আর এখন 'রাহুল বাবা পার করেগা'। রাহুল এখন নীতি, নৈতিকতা, মূল্যবোধের কথা উচ্চারণ করছেন, কিন্তু যখন একের পর দুর্নীতির ধাক্কায় দেশ জেরবার, তখন তিনি মৌনিবাবা ছিলেন কেন?

নীতি নৈতিকতার মুখোশ ধরার পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষতা ও সামাজিক ন্যায় বিচারের মেকি-ফেরিওয়ালারা সেই চিরাচরিত পুরাতন গ্রামাফোনের রেকর্ড বাজাতে ব্যস্ত। ভোট এলেই জাতীয় নিরাপত্তা, দুর্নীতি, অর্থনৈতিক সঙ্কট এসব অগ্রাধিকার পায় না। শিখ নিধন যজ্ঞ করবো, চোরাগোপ্তা দাঙ্গা বাধাবো, ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে বেশি সংখ্যক মুসলিম মধ্যবিত্ত রাজ্য পশ্চিমবাংলায় চোরা পথে ও এমনকী প্রকাশ্যে মুসলিমদের জন্য সুযোগ সুবিধার কথা বলবো, আর এখন ধর্মনিরপেক্ষতার অভিভাবকত্ব ফলাবো--- এ সবই রাজনৈতিক সুবিধাবাদের নামান্তর।

প্রয়োজন সুযোগ্য নেতৃত্ব, শৃঙ্খলাবদ্ধ, সংগঠন আর নীতি- নৈতিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত দেশ পরিচালনার সঠিক দিশা :

বস্তুতপক্ষে সুশাসন ও সার্থক বিকাশের স্বার্থে এমন রাজনৈতিক দলের হাতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হবে যাদের এসব উপকরণ রয়েছে। সঠিক ভাবেই নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি পারিচালিত এনডিএ গুণগত বিচারে অন্যদের চেয়ে দেশের স্বার্থে গ্রহণযোগ্য বিকল্প। অনেকে বলেন মোদী মিডিয়ার সৃষ্টি। কিন্তু মিডিয়া উটপাখি নয়, পরিস্থিতি ও পরিবেশ যাচাই করেই তারা মোদী ও তাঁর দলের সংখ্যাগত সাফল্য তুলে ধরছেন। এই জন্যই মোদী প্রায় সবকটি বিরোধী দল ও গোষ্ঠীর চক্ষুঃশূল। দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে কপটতা ও প্রবঞ্চনার মাধ্যমে বাজিমাত করা যাবে না অনুমান করে অনেকেই প্রলাপ বকছেন। পশ্চিমবাংলার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দুজনেই জেহাদ ঘোষণা করেছেন। আবার এখনকার মুখ্যমন্ত্রী এখন কথাও বলছেন যে বিজেপি, কংগ্রেস ও সিপিএম নাকি এককাট্টা। তারা এখানকার শাসকদলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। বিগত তিন বছরে তখনকার জমানায় আর তার আগে দু' দশক বামফ্রন্ট জমানায় পশ্চিমবাংলার রাজ্যপাঠ কেমন চলছে ও চলেছে তা কী রাজ্যবাসী জানেন না? প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি হিটলারের সঙ্গে মোদীর তুলনা করছেন। বোধ করি ১৯৩০-এর দশকের জমানার ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি সোস্যাল ডেমোক্রাটিক দলের সঙ্গে মিলিতভাবে হিটলার বিরোধী অবস্থান নেননি। এর সুযোগ নিলেন হিটলার। আবার অন্যদিকে হিটলার যখন একনায়কতন্ত্রী ব্যক্তিগত শাসন করেছিলেন, সেই সময় স্তালিন রাশিয়ায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক সাম্যবাদী শাসন বলবৎ করেছিলেন। হিটলার ও স্তালিন ছিলেন একনায়কতন্ত্রের দুটি মুখ। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মোদীর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর দল কংগ্রেসের নেতৃত্বে দিল্লীতে যখন শিখ নিধন যজ্ঞ করে তখন তিনি কেন নীরব ছিলেন? শাহবানু মামলার পর মুসলিম মৌলবাদী তোষণের বিরুদ্ধে কেন তিনি মুখে খোলেননি? আর ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি উচ্চারণ করে টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম ও জামা মসজিদের ইমামের সার্টিফিকেট তাঁকে দেওয়া হয়? ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মের সুড়সুড়ি দেওয়া নয়, সবারই জন্য একরকম আইন বিধান প্রণয়ন প্রয়োজন। ভারতে আশ্চর্য লাগে, সংখ্যালঘুদের প্রতি তোষণ করেও কেন সংখ্যালঘুদের মান উন্নত হয়নি?

তাই শক্তিশালী ও উন্নত ভারত নির্মাণের জন্য প্রয়োজন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, সাংগঠনিক দক্ষতা আর প্রশাসনিক কুশলতা। বোধ করি বলার অপেক্ষা রাখে না যে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্ব ও ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষেই জাতীয় জীবনে নেতিবাচক দিকগুলি পরিহার করা সম্ভব। জাতীয় সংহতি, অর্থনৈতিক বিকাশ ও সুরক্ষার জন্য প্রয়োজন বলিষ্ঠ বিকল্প। মহাভারতে যুক্তিসঙ্গত ভাবেই বলা হয়েছে যে ভীরু, কাপুরুষ, দুর্বল চিত্ত রাজার পক্ষে রাজ্য পরিচালনা সম্ভব নয়। আর দেশ ও দেশবাসীর স্বার্থে নীতি-নৈতিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত সক্রিয় ও গতিশীল রাজনীতি প্রয়োজন— না হলে ভ্রষ্টাচার, অপশাসন ও অস্থিরতা থেকে রক্ষা নেই। এখন মন্ত্র হলো— 'শুভ কর্মপথে ধরো নির্ভয় গান'।

জাতীয়তাবাদী বাংলা

সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

গ্রাহক হোন

গ্রাহক করুন

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০্ টাকা

শক্তি, সঞ্চয়, সামর্থ্য ও ভারতের প্রতিরক্ষা

মেঃ জেঃ কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অবসর প্রাপ্ত)

বহু শতাব্দী যাবৎ বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্র নিজ নিজ রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমা সুরক্ষিত রাখার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে এসেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক রাষ্ট্রকেই আগ্রাসী শক্তির দাসত্ব স্বীকার করতে হয়েছে। দু'টি বিশ্বযুদ্ধ এবং পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের পরই বিবাদ মীমাংসা ও শান্তিপূর্ণভাবে বিভিন্ন সংঘর্ষ সমাপ্তির জন্য বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের নিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্থাপনা হলেও শান্তির পরিবেশ আসেনি। সেখানেও শক্তিধর রাষ্ট্রের আধিপত্যই বহুবার প্রমাণিত হয়েছে।

রাষ্ট্রের সুরক্ষা বর্তমানে শুধুমাত্র শত্রুভাবাপন্ন রাষ্ট্রের আক্রমণে ভৌগোলিক অথবা সমুদ্র উপকূল রক্ষা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। রাষ্ট্রের আকাশসীমা, সমুদ্রে রাষ্ট্রীয় জলসীমা এবং

অর্থনৈতিক অঞ্চলের সুরক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এছাড়াও অভ্যন্তরীণ ও বিদেশী উদ্যোগে মাওবাদের মতো রাষ্ট্রবিরোধী শক্তিকে দমন করে রাষ্ট্রের সুরক্ষা, একতা এবং অখণ্ডতা রক্ষার প্রশ্নও রাষ্ট্রীয় বিষয়েরই অন্তর্গত। এই পরোক্ষ ছায়াযুদ্ধ কোনো এক অথবা কয়েকটি শত্রুভাবাপন্ন রাষ্ট্রের দ্বারাও সংগঠিত এবং সংঘটিত হতে পারে। 'হাজার ক্ষতের দ্বারা' কোনো রাষ্ট্রকে সামরিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দিক দিয়ে ধীর রক্তক্ষরণের মাধ্যমে প্রথমে শক্তিহীন করে সময়ে টুকরো টুকরো করে দেওয়ার স্ট্রাটেজিও ব্যবহৃত হতে পারে। উপরোক্ত সমস্ত আক্রমণই ভারত মাত্র ৬৫ বছরের স্বাধীনতাউত্তর জীবনে উপলব্ধি করেছে।

স্বাধীন ভারতের জন্মমুহূর্ত থেকে তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং ভারত সরকার বলে এসেছে, ভারত সকল প্রতিবেশীর সঙ্গে বন্ধুত্বের পরিবেশে থাকতে চায়, কারও এক ইঞ্চি ভূমিখণ্ডের উপর ভারতের কোনো লোভ নেই। সে কারণে প্রতিরক্ষার জন্য ব্যয় বরাদ্দ বাড়ানোর কোনো যৌক্তিকতাই নেই। তাঁরা ইতিহাস ভুলে গিয়ে ছিলেন। "...এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি, সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি...", ভারতভূমি। যুগ যুগ ধরে এই শস্যশ্যামল, মনোরম, সমৃদ্ধ ভূখণ্ড বিদেশীদের লোলুপ লালসার শিকার হয়েছে। আক্রান্ত হয়েছে, অধিকৃত হয়ে বিদেশী শাসনের পদানত হয়েছে। বিগত ১৫ শত বছরের ইতিহাস প্রণিধানযোগ্য।

আজকের বিশ্বে প্রযুক্তির যত উন্নতি ঘটেছে, শত্রুভাবাপন্ন রাষ্ট্রের শত্রুতা করার স্পর্ধা, সুযোগ এবং তীব্রতা সুদূর-প্রসারী হয়েছে। বর্তমান অস্ত্রসম্ভারের ক্ষেপণ দূরত্ব এবং ধ্বংসকারী ক্ষমতা, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তদুপরি, সমূহ নরহত্যার হাতিয়ার হিসাবে পরমাণু অস্ত্র, রাসায়নিক অস্ত্র আজ বহু রাষ্ট্রের হাতেই পৌঁছেছে। গভীর সমুদ্রতল, ভূমি, আকাশ, মহাকাশ যে কোনো স্থান দিয়ে আক্রমণ আসতে পারে, কোনোকিছুই শত্রুপক্ষের নজর এড়িয়ে রাখা যাবে না। উপগ্রহ মারফত বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে, যে কোনো স্থান দৃষ্টিগোচর করা সম্ভব। বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি নিজেদের রাষ্ট্রীয় স্বার্থের প্রয়োজন মেটাতে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত বন্ধুরাষ্ট্রকে গোপনে অথবা প্রকাশ্যে এই প্রযুক্তির সুযোগ দিতে বদ্ধপরিকর।

ভারত রাষ্ট্রের কোনো শত্রুভাবাপন্ন রাষ্ট্র থাকা উচিত ছিল না। স্বাধীনতার লক্ষ্যে এবং অশান্তি দূর করতে ভারত ভূখণ্ড বিভাজিত করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল। চীন তিব্বত অধিগ্রহণ করে ভারতের এক বিশাল ভূখণ্ড দাবি করে ১৯৬২-তে ভারত ভূখণ্ড আক্রমণ করল। যদিও তারা ভারত ভূখণ্ড ত্যাগ করে ফিরে গিয়েছিল, কিন্তু এখনও তাদের দাবি পরিত্যাগ করেনি। অরুণাচল এবং লাদাখ ভূখণ্ডের উপর তাদের দাবি প্রতিদিন বিভিন্ন ভাবে জানিয়ে দিচ্ছে।

যে অশান্তি দূর করে দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতমাতার অঙ্গচ্ছেদন করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, সেই পাকিস্তান তিনবার ভারত আক্রমণ করেছে, ছায়াযুদ্ধের মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভারতীয় রক্তস্রোত প্রবাহিত করে চলেছে। জেহাদি সন্ত্রাসবাদীরা পাকিস্তানের এই ছায়াযুদ্ধের শক্তিশালী অস্ত্র। ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের বহু মানুষকে পাকিস্তানে নিয়ে গিয়ে কট্টর ইসলামী

চিন্তাধারায় মগজ ধোলাই করে অস্ত্র গোলাগুলিতে প্রশিক্ষিত করে ভারতে পাঠাচ্ছে। তাদের মাধ্যমে পাক পরিচালকদের নির্দেশমতো সাম্প্রদায়িক অশান্তি এবং সন্ত্রাস সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রেখেছে। তাদের অত্যাচারের ফলস্বরূপ পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। পাকিস্তানের অভ্যন্তরে 'তাহরিক-ই-তালিবান, পাকিস্তান' অর্থাৎ পাকিস্তানি তালিবান রাষ্ট্রদ্রোহিতা করে প্রতিদিন হাজার হাজার পাকিস্তানি নাগরিকের প্রাণ নাশ করে চলেছে। তারা সরকার পরিবর্তন করে কট্টর ইসলামিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করার দাবি জানাচ্ছে।

এই চিত্র সামনে রেখে ভারতের প্রতিরক্ষার পরিকল্পনা রূপায়িত করার প্রয়োজন। এই পরিকল্পনা নিশ্চয়ই হতে হবে সর্বাত্মক। শুধুমাত্র ভারতের নৌ, বিমান এবং স্থলবাহিনীই নয়, রাষ্ট্রের গোয়েন্দা বাহিনী, পুলিশ, আধাসামরিক বাহিনী এবং কূটনৈতিক বিভাগের এই পরিকল্পনায় যোগ্য স্থান পাওয়া উচিত।

এই চিত্র সামনে রেখে ভারতের প্রতিরক্ষার পরিকল্পনা রূপায়িত করার প্রয়োজন। এই পরিকল্পনা নিশ্চয়ই হতে হবে সর্বাত্মক। শুধুমাত্র ভারতের নৌ, বিমান এবং স্থলবাহিনীই নয়, রাষ্ট্রের গোয়েন্দা বাহিনী, পুলিশ, আধাসামরিক বাহিনী এবং কূটনৈতিক বিভাগের এই পরিকল্পনায় যোগ্য স্থান পাওয়া উচিত।

কিন্তু পরিকল্পনা রূপায়ণ করার জন্য একদিকে যেমন সীমান্তে সৈন্য চলাচলের জন্য রাস্তা নির্মাণ করতে হবে, সামরিক বিমানক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। প্রয়োজনে সীমান্তের অতি নিকটে অবস্থিত গ্রামগুলিকে, বিশেষ করে জম্মু-কাশ্মীরের দুর্গম অঞ্চলে, বাংলাদেশ সীমান্তে, কিছুটা সরিয়ে এনে নতুন জায়গায় সরকারি খরচে উন্নত গ্রাম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক গোয়েন্দা বাহিনীকে বহুগুণ উন্নত করারও প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত উপকরণ তাদের দিতে হবে। সকলেই জানেন, ভারতের বিমান বাহিনীতে লড়াকু বিমানের যে ন্যূনতম যত স্কোয়াড্রন থাকা উচিত তা নেই এবং বহু বিমানই অনেক বছরের পুরাতন। সর্বাধুনিক বিমানের সংযোজন প্রয়োজন। নৌ-বাহিনীও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ভারতের দীর্ঘ উপকূল এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল, আন্দামান-নিকোবর ও লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জের সুরক্ষার জন্যও বিমান ও নৌ-বাহিনীর প্রয়োজন। বিগত কয়েক সপ্তাহে নৌবাহিনীর সাবমেরিন ও যুদ্ধ জাহাজে দুর্ঘটনার ঘটনা ভারতবাসীকে সচকিত করেছে। হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে দেশীয় প্রযুক্তিতে পরমাণু পরিচালিত সাবমেরিন ও স্বদেশে-নির্মিত জাহাজের এই দুর্ঘটনা ভারতের নৌ-বাহিনীকে মহাসাগরের প্রতিরক্ষার উপযোগী (ব্লু-ওয়াটার নেভি) করে তোলার বিষয়ে প্রশ্নচিহ্ন এনে দিয়েছে। আমি আত্মবিশ্বাসী যে ভারত এই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠবে। ভারতের মেধা আছে, আছে উচ্চ প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত মানব সম্পদ। আর আছে প্রবল ইচ্ছা শক্তি।

ভারতের স্থলবাহিনীর শুধুমাত্র সংখ্যাগত দিক দিয়ে অনেক বেশি সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন। বিশেষ করে ভারতের দীর্ঘ সীমান্তের প্রতিটি কিলোমিটার বছরের প্রতিটি দিন চব্বিশ ঘণ্টা নজরদারির প্রয়োজন। কোথাও প্রতিবেশী রাষ্ট্র সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে এলাকা দখল করবে, কোথাও বা সন্ত্রাসবাদী অনুপ্রবেশ করবে, কোথাও বা অবৈধ অনুপ্রবেশ, জালনোট ও মাদক দ্রব্য সরবরাহ অথবা সমুদ্রপথে সন্ত্রাসবাদী অনুপ্রবেশ করিয়ে আর একটা ২৬/১১ ঘটাবার প্রয়াস হবে। ভারতের উপকূল রক্ষীবাহিনী, কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনী, সীমান্তরক্ষী বাহিনী, অসম রাইফেলস-কে একসূত্রে প্রতিরক্ষার আওতায় আনার প্রয়োজন। তাদের প্রশিক্ষণও অনুরূপ হতে হবে। এছাড়া বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী, সিমি, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন, হিজবুল মুজাহিদিন, মাওবাদীগোষ্ঠীদের দমন করার নিমিত্ত সামরিক এবং আধাসামরিক দলকে এক ছাতার নীচে এনে তাদের কর্ম-ক্ষমতা, প্রশিক্ষণ, দেশের সুরক্ষার তাগিদে সর্বস্ব নিবেদন করার মানসিকতা আনতে হবে। অন্যথায় বর্তমানের প্রতিদিনের সুরক্ষাবাহিনীর মৃতদেহের মিছিল বন্ধ হবে না। বন্ধ হবে না সীমান্তে মুণ্ডচ্ছেদন করে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা।

কিন্তু এই সমস্ত কিছু করার জন্য প্রয়োজন বহু অর্থের। বর্তমানের প্রতিরক্ষা ও স্বরাষ্ট্র খাতের বরাদ্দ এতই অপ্রতুল যে কোনো কিছুই করা সম্ভব নয়। সীমান্তের রাস্তা, বিমান, নৌ-বাহিনীর নবীকরণ, আরও অনেক স্থলবাহিনীর ব্যাটেলিয়ন প্রতিষ্ঠা, শ্রেষ্ঠ প্রযুক্তির অস্ত্র উপকরণ সংগ্রহ সবকিছুই নির্ভর করে রাষ্ট্রের আর্থিক সচ্ছলতার উপর। পার্বত্য যুদ্ধে অপরিহার্য যে বিশেষ কামান, তা আজও সৈনিকদের হাতে পৌঁছয়নি।

ভারত এক জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র। যে রাষ্ট্রে ৭০ শতাংশের মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থান করছেন। সেই অগণিত অতি দরিদ্র, অজ্ঞ, নিরন্ন, গৃহহীন, শিক্ষাহীন মানুষের জীবনমানের উন্নয়নই যে রাষ্ট্রের প্রধান আদর্শ, সে ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা খাতে অত্যধিক ব্যয়বরাদ্দ সম্ভব নয়। অতএব যে ঢিমেতালে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটছে তেমনি চলবে আরও অনেক বছর। কিন্তু ভারতের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন চীন তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ করে ফেলেছে। তিব্বতে সীমান্ত বরাবর উন্নত রাস্তা চুম্বি ভ্যালির ইয়াটুং পর্যন্ত নিয়ে এসেছে, নিয়ে এসেছে রেলপথ। বিমানক্ষেত্র উন্নত করে সারাবছর সদা প্রস্তুত

বিমান এবং সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত রেখেছে। সামরিক খাতে তাদের ব্যয় বরাদ্দ অনেক বেশি। একটা স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যা করা সম্ভব, বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতন্ত্র এবং হতদরিদ্র রাষ্ট্রে তা করা সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ চীন 'প্রতি পরিবারে এক সন্তান' আইন প্রবর্তন করে তাদের জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে কমিয়ে ফেলেছে। কোনো ধর্মীয় অথবা সম্প্রদায়ের প্রতিবাদের কোনো প্রশ্নই সেখানে উঠতে পারে না। উঠলে কঠোর শাস্তি। কিন্তু ভারতে সীমিত পরিবার, আইন করে বাধ্যতামূলক করার কোনো সম্ভাবনাই নেই। অথচ সমস্ত পিছিয়ে পড়া এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পরিবারে সন্তানসংখ্যা বিশ্বে সর্বাধিক। তার উপর অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা ভারতের জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছে। ফলে নিখরচায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দু'টাকা করে চালের কেজি দিতে রাষ্ট্রের অর্থভাণ্ডার শূন্য। কৃষি শিল্পের উন্নয়নে অর্থের অভাব। এমতাবস্থায় প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়বরাদ্দ বাড়ানো এবং তার সুষ্ঠু ব্যবহার কঠিন সমস্যার কারণ। তার উপর ভ্রষ্টাচার রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে, বিশেষ করে প্রতিরক্ষা অস্ত্র উপকরণের ক্ষেত্রে প্রতিদিনের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভ্রষ্টাচার রাষ্ট্রের প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিরক্ষা ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আমলাতন্ত্র মনে করেন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার স্ট্রাটেজি তাঁদের নখদর্পণে। এ বিষয়ে তাঁরাই শেষকথা। আমি বিশ্বাস করি, ভারতের সেনাবাহিনীর তিন অঙ্গের নেতৃত্ব, সীমান্ত ও উপকূল রক্ষাবাহিনী এবং আধাসামরিক বাহিনীর নেতৃত্ব এই সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। তাঁরা জানেন আগামী ২০ বছরে তাঁদের কি প্রয়োজন।

ভারত সরকারকে সেই অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করতে হবে। এটাও জানা প্রয়োজন, যতদিন দেশে উন্নত ট্যাঙ্ক, বিমান, যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণ প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক ক্ষমতা না সৃষ্টি হয়, বিদেশ থেকেই সেইসব অস্ত্র উপকরণ আমদানি করতেই হবে। বরাত দেওয়ার পর অন্তত ১০ থেকে ১২ বছর সময় লাগে সেইসব যুদ্ধজাহাজ, যুদ্ধবিমান হাতে পেতে। ততদিন বিশ্বে ওইসব জিনিস পুরোনো হয়ে (অবসোলিড) যায়। অতএব এই সমস্ত চিন্তা করে আগামী ২০ বছর পর কি প্রযুক্তির, কি অস্ত্র উপকরণ প্রয়োজন হতে পারে সেই ভবিষ্যৎ দর্শন করেই আজ বরাত দিতে হবে। ব্যাপারটা সহজ নয়। মন্ত্রী অথবা প্রশাসন হলেই সেই দর্শন (দূরদর্শিতা) জন্মায় না। ভারতবর্ষের সামরিক বাহিনীর প্রতিটি সদস্য চিরকাল দেশমাতৃকার চরণে দেশ ও দেশবাসীর সুরক্ষার জন্য প্রাণ বলিদান দিয়ে এসেছেন। প্রয়োজনে বারংবার তাঁরা নিজেদের রক্তস্রোত প্রবাহিত করে দেবেন। তাতে হয়তো জয় আসবে না। কিন্তু তাঁদের হাতে যুদ্ধজয়ের অস্ত্রটি জুগিয়ে দেওয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সঠিক সময়ে কার্যকর গোয়েন্দা তথ্যও সামরিক বাহিনীকে দিতে হবে। অন্যথায় ১৯৬২-র কলঙ্ক আবার ঘটতে পারে। 'ভারত এক দুর্বল রাষ্ট্র, কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ভারতের নেই'— বিশ্বমানসে সেই ধারণা দূর করার প্রয়োজন এমন করে আর কখনও প্রতিভাত হয়নি।

বেনারসী, সিল্ক, তাঁত শাড়ীর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

প্রিয় গোপাল বিষয়ী

স্থাপিত - ১৮৬২

বড়বাজার ঃ ৭০, পণ্ডিত পুরুষোত্তম রায় স্ট্রীট (খেংড়াপট্টী), কোলকাতা - ৭,

ফোন ঃ ২২৬৮ ৬৪০২, ২২১৮ ০৩৪৮

২০৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা - ৭, ফোন ঃ ২২৬৮ ৬৫০৮

গড়িয়াহাট ঃ ১১৩/১এ, রাসবিহারী এভিনিউ, ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের বিপরীতে,

কোলকাতা - ৭০০ ০২৯, ফোন ঃ ২৪৬৫-৮২৪৬

এছাড়া আমাদের আর কোনো শাখা নেই

ধর্মনিরপেক্ষতা ও তোষণনীতি

অমিতাভ ঘোষ

ভারতীয় সংবিধানে Preamble-এ Secular শব্দের উপস্থিতি রয়েছে— সেই শব্দের বঙ্গানুবাদ 'ধর্মনিরপেক্ষ'। এই অনুবাদ সার্থক কিনা না সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। সেই বিতর্কের মধ্যে এখনই প্রবেশ না করে ভারতের সংবিধান সম্বন্ধে কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশন করা যেতে পারে। ১৯৫০ সালে ২৬ জানুয়ারি তারিখে যে সংবিধান প্রবর্তিত হয় সেই সংবিধানের Preamble-এ Secular শব্দটি অনুপস্থিত ছিল। এই বিতর্কিত শব্দটির আবির্ভাব হয়েছিল একটা অস্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে। ভারতে তখন আপৎকালীন শাসনব্যবস্থা বা Emergency চালু হয়ে গেছে। গণতন্ত্রের তখন রুদ্ধশ্বাস অবস্থা। বশংবদ রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আহমেদকে দিয়ে সই করিয়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সংবিধান সংশোধন করলেন ১৯৭৬ সালে। সংবিধানে দুটি শব্দ— Socialist ও Secular— জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। লন্ডনের বিখ্যাত Economist পত্রিকা সে সময়কার স্বৈরাচারী মহিলা প্রধানমন্ত্রীর সম্বন্ধে মন্তব্য করলো— 'The empress has become imperious'। ইন্দিরা গান্ধীর আপৎকালীন শাসনকালের অবসান ঘটলো ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে। জনতাপার্টি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলো, কিন্তু প্রক্ষিপ্ত শব্দের মাধ্যমে সংবিধানের যে দূষণ ঘটলো আপৎকালীন অবস্থায় তার নিরাকরণ করার কোনো উদ্যোগই নিলেন না জনতা পার্টির নেতৃবৃন্দ।

সব দেশেই সংবিধান সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে দেশবাসীর। সংবিধানের সংশোধন করা হয়ে থাকে কালভদ্রে; নিতান্ত প্রয়োজন না হলে সংবিধানে হস্তক্ষেপ করা হয় না। ১৭৭৬ সালে ৪ জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম হয়। তারপর ২৩৪ বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সংশোধিত হয়েছে মাত্র ২৮ বার— শেষ সংশোধন সম্পন্ন হয়েছে গত বছর ২০১৩ সালে। ভারতের সংবিধান ৬৪ বছর আগে চালু হয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই শতাধিক amendment বা সংশোধন দ্বারা ভারতীয় সংবিধান কণ্টকিত হয়েছে। অর্থাৎ গড়ে প্রতি বছর ভারতীয় সংবিধান একাধিকবার সংশোধিত হয়েছে। ফলে সংবিধানের মাহাত্ম্য ও মহিমা যৎপরোনাস্তি ভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ১৯৭৬ সালের আপৎকালীন সংশোধন যার মাধ্যমে সংবিধানে অপ্রয়োজনীয় Secular শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে সেটি হচ্ছে ৪২ নম্বরের সংশোধন।

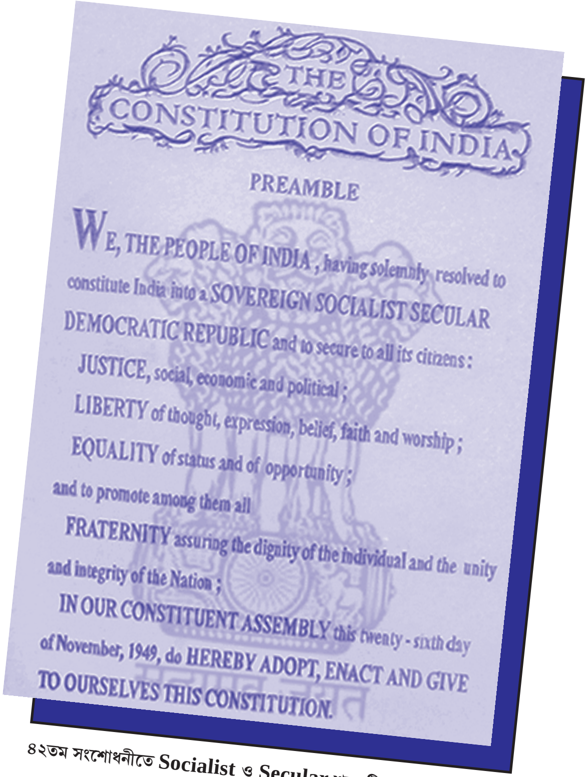

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity;

and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

৪২তম সংশোধনীতে **Socialist** ও **Secular** শব্দদুটি ঢোকানো হয়েছে।

Secular শব্দটি ইংরেজি ভাষার অন্তর্গত। এই শব্দটির প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে হলে ইংরেজি শব্দকোষ বা অভিধানের শরণাপন্ন হতে হবে। Oxford Dictionary বা Webster Dictonary-র পাতা খুললেই দেখা যাবে লেখা আছে এই শব্দের সঙ্গেই ধর্মের (ইংরেজিতে যাকে religion বলা হয়) কোনো সম্পর্ক নেই। আধ্যাত্মিকতা বা পারলৌকিকতার সঙ্গে এর কোনো সংস্রব নেই। Secular শব্দের অর্থ জাগতিক বা ইহলৌকিক (worldly, mundane)। ইউরোপে মধ্যযুগে খৃস্টান জগতে ধর্মগুরু পোপ রাজন্যবর্গের দেশ শাসনের ব্যাপারে প্রায়ই হস্তক্ষেপ করতো। ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরির সঙ্গে পোপ-এর সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল রাজার ব্যক্তিগত বিবাহের প্রস্তাবকে উপলক্ষ্য করে। পোপ অষ্টম হেনরিকে ex-communicate বা খৃস্ট সমাজ থেকে বহিষ্কার করলেও অষ্টম হেনরি পোপের বশ্যতা স্বীকার করেননি। রাজশক্তির সঙ্গে ধর্মীয় গুরু বা কর্তৃপক্ষের লড়াই ক্রমে ছড়িয়ে পড়ায় দাবি উঠলো— কোনো রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ চলবে না। Adminstration বা শাসনব্যবস্থা হবে secular। এইভাবে secular শব্দের উৎপত্তি। মুসলিম জগতেও এই ধরনের আন্দোলন হয়েছিল— তুরস্কের কেমাল পাশা খলিফাতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে শাসনব্যবস্থায় ধর্মীয় গুরুর হস্তক্ষেপের সম্ভাবনাকে খারিজ করে দেন। ভারতবর্ষে পোপ বা খলিফার মতো ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব নেই।

কাজেই এই দেশের সংবিধানে secular শব্দের প্রক্ষেপ নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। সংবিধানের প্রণেতারাও তাই ১৯৫০ সালের প্রবর্তিত সংবিধানের preamble-এ secular শব্দ ব্যবহার করেননি। এখানে উল্লেখ

করা যেতে পারে যে, secular শব্দের সঙ্গে সর্বধর্ম সমভাব বা ধর্মনিরপেক্ষ (কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাতহীন— equidistant from all religions) —এইসব শব্দগুচ্ছের কোনো সম্পর্ক নেই। secular মানে নিতান্তই ইহলৌকিক বিষয় সম্বন্ধিত— পারলৌকিক চর্চার স্থান এখানে নেই। তাই সংবিধানে secular শব্দের প্রয়োগ অপ্রয়োজনীয় redundant। তা সত্ত্বেও কংগ্রেস-নেত্রী ইন্দিরা গান্ধী Emergency-

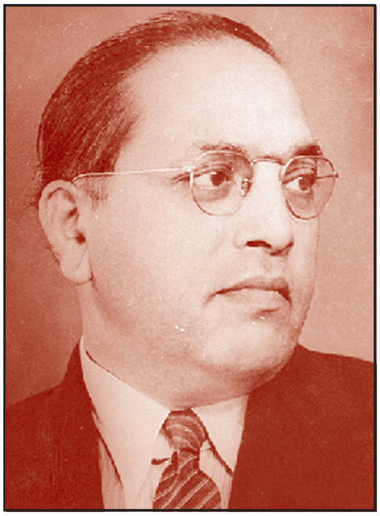

ড: আম্বেদকর

শ্রীমতী গান্ধী

ভীমরাও আম্বেদকর ১৯৪০ সালে অনুষ্ঠিত মুসলিম লিগের লাহোর সম্মেলনে গৃহীত পাকিস্তান প্রস্তাব বিশ্লেষণ করে একটি অসামান্য গ্রন্থ প্রণয়ন করলেন— শীর্ষক হচ্ছে— Thoughts on Pakistan। তিনি মন্তব্য করলেন যে, ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাজনের প্রস্তাব কোনো দৃষ্টিকোণ থেকেই সমর্থনযোগ্য নয়— তবুও যদি কোনো কারণে— under compelling circumstance —অযৌক্তিক ভারত বিভাজন বাস্তবায়িত করতে হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে দেশের খণ্ডিত অংশগুলির মধ্যে লোকবিনিময় বা exchange of population করতে হবে— যেমন অতীতে হয়েছে গ্রীস ও তুরস্কদেশের মধ্যে। অর্থাৎ দেশবিভাজন হবার পর পাকিস্তানে হবে হিন্দুশূন্য ও অবশিষ্ট Indian Union হবে মুসলিম শূন্য।

র অন্ধকারময়, ভয়াল পরিমণ্ডলের সুযোগ নিয়ে সংবিধানে secular শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটালেন কেন— তার তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে ভারত বিভাজনের সময়কার ঘটনাবলীর দিকে সিংহাবলোকন করতে হবে। অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বহু দশক ব্যাপী আন্দোলন করার পর তদানীন্তন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ পাকিস্তান প্রস্তাব মেনে নিতে প্রস্তুতি নিচ্ছে সেই সন্ধিক্ষণে মনীষী ড. ভীমরাও আম্বেদকর ১৯৪০ সালে অনুষ্ঠিত মুসলিম লিগের লাহোর সম্মেলনে গৃহীত পাকিস্তান প্রস্তাব বিশ্লেষণ করে একটি অসামান্য গ্রন্থ প্রণয়ন করলেন— শীর্ষক হচ্ছে— Thoughts on Pakistan। তিনি মন্তব্য করলেন যে, ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাজনের প্রস্তাব কোনো দৃষ্টিকোণ থেকেই সমর্থনযোগ্য নয়— তবুও যদি কোনো কারণে— under compelling circumstance —অযৌক্তিক ভারত বিভাজন বাস্তবায়িত করতে হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে দেশের খণ্ডিত অংশগুলির মধ্যে লোকবিনিময় বা exchange of population করতে হবে— যেমন অতীতে হয়েছে গ্রীস ও তুরস্কদেশের মধ্যে। অর্থাৎ দেশবিভাজন হবার পর পাকিস্তানে হবে হিন্দুশূন্য ও অবশিষ্ট Indian Union হবে মুসলিম শূন্য। এই লোকবিনিময় সম্পন্ন করতে হবে উভয় সরকারের Joint supervision বা যৌথ তত্ত্বাবধানে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়া বিস্থাপিত লক্ষ লক্ষ লোককে নিজের নিজের দেশে ফেরত পাঠাবার জন্য Marshall Plan চালু করা হয়। কয়েক বছরের মধ্যেই Marshall Plan-এর মাধ্যমে এই বিশাল rehabilitation বা পুনর্বাসনের প্রকল্প সাফল্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ হয়। কাজেই ড. আম্বেদকর ঘোষণা করলেন যে, ভারত বিভাজন ও লোকবিনিময় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। লোক বিনিময় না করে ভারত বিভাজন করার ফলে partition Agenda unfinished হয়ে রইলো— দেশ বিভাজনের প্রকল্প অধরা থেকে গেল।

ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পার্লামেন্টে লোক- বিনিময়ের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রেখেছিলেন ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক হিন্দু হত্যার (geno-

cide) পর— প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর বিরোধিতার ফলে লোকবিনিময়ের প্রস্তাব খারিজ হয়ে যায়। দেশ বিভাজনের পরেও জওহরলাল চালিত কংগ্রেস মুসলমানদের ভারতে রেখেছিল ভোটব্যাংক হিসাবে ব্যবহার করার জন্য। ভারতের তদানীন্তন মুসলমান অধিবাসীরা জানতো যে পাকিস্তান সৃষ্ট হবার পর তাদের ভারতে থাকার নৈতিক অধিকার নেই। কংগ্রেস সেই মুসলিম মনস্তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে মুসলমানদের ভোট আদায় করেছে বছরের পর বছর। মুসলমানদের মনে গোপন ভীতির সঞ্চার করা হয়েছিল যে কংগ্রেসকে ভোট না দিলে ভারত ছেড়ে চলে যেতে হবে। ভারত বিভাজনের সময় hostage theory নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছিল। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অভিমত ছিল যে, পাকিস্তানের হিন্দুদের নিরাপত্তার জন্য ভারতনিবাসী মুসলমানরা hostage হিসাবে থাকবে। পাকিস্তানের হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হলে ভারতে বসবাসকারী মুসলমানরা বিপদে পড়বে এই আশংকায় পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ সেখানকার হিন্দু অধিবাসীদের সুরক্ষার বন্দোবস্ত করবে। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অভিমত ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। পাকিস্তানে— কি পূর্ব, কি পশ্চিম— হিন্দুদের ওপর অত্যাচার অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও তার প্রতিক্রিয়ায় ভারতনিবাসী মুসলমানদের গায়ে বিন্দুমাত্র আঁচড় লাগেনি।

ভারতীয় মুসলিমদের কংগ্রেস নির্ভরতা স্বভাবতই কালক্রমে কমে এসেছে। কংগ্রেসকে ভোট না দিলেও ভারত থেকে বিতাড়িত হবার আশঙ্কা দূরীভূত হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ গোপন ভীতি প্রদর্শনের পন্থা পরিত্যাগ করে তোষণ নীতির আশ্রয় নিয়েছে। কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ আচরণ সংবিধানের ১৪নং ধারা অনুযায়ী সংবিধান বিরোধী। এই বিরোধকে স্তিমিত করার জন্য ১৯৭৬ সালে ৪২নং সংশোধনে সংযোজিত হলো secular শব্দটি। secular শব্দের ইংরেজি অভিধান নিহিত অর্থকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কংগ্রেসী সরকার তার বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে secular শব্দের অর্থ করলো শুধুমাত্র মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের নির্লজ্জ তোষণ। ভারতীয় সংবিধানে secular শব্দের সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা ড. প্রবীণভাই তোগাড়িয়া কিছুদিন আগে কলকাতায় আহুত জনসভায় পরিসংখ্যান দিয়েছেন কীভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে লক্ষ কোটি টাকা ভারতীয় মুসলিমদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এসেছে আর একটি নির্লজ্জ প্রকল্প— সাচার কমিটির রিপোর্টকে অবলম্বন করে। দিল্লীর কোর্টে মামলা হয়েছে— সাচার কমিটির রিপোর্ট সংবিধান বহির্ভূত এই অভিযোগ করে। কিন্তু কে কার কথা শোনে! কংগ্রেস সৃষ্ট এই ব্যাধি ক্যান্সারের মতো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা এখন ইসলাম ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্বে পর্যবসিত হয়েছে। এই বিষয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও উত্তরপ্রদেশের অখিলেশ যাদবের মধ্যে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন ভারতের রাজস্বে মুসলমানদেরই অগ্রাধিকার। Ecology-তে sound pollution বা শব্দ দূষণ কথাটা চালু আছে। ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্গত secular শব্দের দূষণ সব সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার ফলে এখন যে কদর্য তার ওপর আরোপিত হয়েছে তা হচ্ছে বেপরোয়া মুসলিম তোষণ। দেশকে অবিলম্বে এই শব্দ দূষণ থেকে মুক্ত করতে হবে।

(লেখক একজন সরকারি আধিকারীক।)

R. K. WIRE PRODUCTS LTD.

167, Netaji Subhas Road
Rajakatra, Kolkata - 700 007
Phone : 2258-0042 / 43 / 44
Fax : 2258-0014

‘আগমার্কা’ সেকুলার সাজতে কংগ্রেসী চক্রান্তের ব্যাপকতা

দেবীপ্রসাদ রায়

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের বহু আগে থেকেই সাধারণ ভারতবাসীর কাছে বিজেপি-আর এস এস-র প্রয়োজনীয়তা এবং ক্রমবর্ধমান গ্রহণীয়তাকে বিনষ্ট করার উদ্দেশ্য নিয়ে এক ব্যাপক চক্রান্তের জাল রচনা করেছে স্বরাষ্ট্রদপ্তর। এ ঠিক এখনই নির্বাচনের আগে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত মনে করছে কংগ্রেস, তাই সিবিআইয়ের সহায়তার সেই চক্রান্ত বাস্তবায়নে সচেষ্ট হচ্ছে। লক্ষ্য করে দেখার মতো, যে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে অসীমানন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এতদিন পরে সেই অসীমানন্দ নাকি এক গোপন স্বীকারোক্তিতে বলেছে যে সন্ত্রাসবাদীরা প্রশ্রয়িত হচ্ছে আরএসএস সংগঠন দ্বারা। এই স্বীকারোক্তি সত্যিই দেওয়া হয়েছে কিনা তা দেশবাসীর জানার উপায় নেই— গোপন যদি, এই মুহূর্তে কী কারণে তা প্রকাশ করা হচ্ছে? প্রকাশ করছে কে না সিবিআই যে সংস্থাটি ‘তোতাপাখি’ অভিধায় অলংকৃত হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা। এর কিছুকাল আগেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুশীলকুমার সিন্দে এক বিবৃতি দিয়ে রেখেছেন এক কাল্পনিক সন্ত্রাসবাদ উৎসের কথা— সে উৎস নাকি আর এস এস। নিজেদের ‘আগমার্কা’ সেকুলার বলে প্রতিভাত করতে হলে ভোটের জন্যই মুসলিম সন্ত্রাসবাদ উৎসের বিপরীতে একটা হিন্দু সন্ত্রাসবাদ উৎস খুঁজতে হবে এবং আর এস এস সেই পরিকল্পিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সহজলভ্য উৎস। কারণ মুসলিম জনগণের এক বৃহদংশ সহ ‘সেকুলারিজম’ উপজীবী কিছু রাজনৈতিক নেতার সমর্থন অনায়াসেই চলে আসবে সিন্দে তথা কংগ্রেসের দিকে।

এই চক্রান্তের দাঁড়ায় (কাঁকড়ার দাঁড়ার মতো) একটি অংশ প্রতীয়মান হয়েছে ২০০৮ সালের নভেম্বরে মুম্বাই-য়ে ধারাবাহিক বিস্ফোরণকে কেন্দ্র করে। সেই সময় কয়েকদিন ধরেই তাজওবেরয় নরিম্যান হাউসের লেলিহান অগ্নিশিখার মধ্যে ভারতীয় জওয়ানদের/ স্বরাষ্ট্রকর্মীদের সন্ত্রাস

সুশীল কুমার সিন্দে

মোকাবিলার প্রয়াস নিশ্চয়ই মনে পড়বে। ধারাবাহিক সংঘাতের কালে বহুজনের সঙ্গে মারা গিয়েছিলেন এক দক্ষ পুলিশ অফিসার হেমন্ত কারকারে। ধৃত সন্ত্রাসবাদী আজমল কাশভকে দীর্ঘদিন রাজার হালে পুষে অবশেষে দেশবাসী-প্রতিক্রিয়ার চাপে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল। আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সি আই এ-র রিপোর্টে এই সন্ত্রাসী-আক্রমণের জন্য পাকিস্তানের আই এস আই এবং আলকায়দাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সি আই এ-র প্রাক্তন বিশ্লেষক ব্রাস রিডেল চারজন মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাউথ-এশিয়া বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি মার্কিন সংবাদপত্র ‘দ্য ডেইলি বিস্ট’ এবং একটি ওয়েবসাইটে জানিয়েছেন যে পাকিস্তানের লস্কর-ই-তৈবা ওই জঙ্গি আক্রমণের ছক তৈরি করেছিল বেশ কয়েকবছর ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে গবেষণা করে। এই হামলার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল পাকিস্তান বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক দাউদ সৈয়দ গিলানী যে

স্বামী অসীমানন্দ

লস্কর-ই-তৈবার নির্দেশে নাম বদল করেছিল ডেভিড কোলম্যান হেডলি নামে। রিডেল আরো জানিয়েছিলেন হামলাকারীদের বেশ কয়েকজনকে পাকিস্তান নৌবাহিনী ও আই এস আই প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। এ হেন হামলা, রিডেলের মতে ৯।১১ হামলার পরেই এই মুম্বই-হামলা, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

হামলা এবং হেমন্ত কারকারের মৃত্যুকে লতায় পাতায় আর এস এস সম্পর্কিত করে প্রচারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে চাতুর্যের সঙ্গে। মহারাষ্ট্রের অবসরপ্রাপ্ত আইজি একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন সম্প্রতি। তার নাম ‘Who Killed Karkare’। এতে বঙ্গভবন লেনে সি এস টি-কামা হসপিটালে সংঘর্ষের সময়ে মহারাষ্ট্রের এটিস প্রধান কারকারেকে

গোয়েন্দা দপ্তরের আর এস এস প্রভাবিত অংশের সাহায্যে হত্যা করা হয়েছিল বলে 'গ্রন্থ'টিতে দাবি করা হয়েছে। গ্রন্থকার লক্ষণীয়ভাবে একজন মুসলমান অফিসার এ এস এম মুশারফ। ৩২০ পৃষ্ঠার ওই গ্রন্থটিতে ভারতীয় গোয়েন্দা দপ্তরের নেটওয়ার্কের সমালোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, মুম্বই গোয়েন্দা দপ্তরকে উক্ত হামলা নিয়ে সতর্ক করেছিল আমেরিকা, তা নাকি আমল দেওয়া হয়নি। তিনি তখন কী করছিলেন— তা অবশ্য গ্রন্থকার বলেননি। লিখেছেন ওই দায়িত্বশীল অফিসার, ১৩০ কোটি ভারতবাসীর নিরাপত্তার চাইতে স্বল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণদের স্বার্থ রক্ষা করাতেই গোয়েন্দা দপ্তরের আগ্রহ ছিল। লিখেছেন, ব্রাহ্মণ্যবাদীদের এই ষড়যন্ত্র বিষয়টি গোপন রাখা হয়েছিল নরেন্দ্র মোদী বা লালকৃষ্ণ আদবানি অথবা শিবসেনা প্রধান বালঠাকরের কাছে, অব্রাহ্মণ বলে। হেমন্ত কারকারেকে সরিয়ে দেওয়ার পর দ্রুত এক ব্রাহ্মণ সন্তান পি. রঘুবংশীকে কারকারের পদে বসানো হয়েছিল। কী সাংঘাতিক, অবাস্তব, উস্কানিমূলক এবং বিভেদমূলক বক্তব্য সব! দেশের পক্ষে একান্ত বিপজ্জনক এই সব অভিযোগের তদন্ত হচ্ছে না কেন— শুধুই হাওয়ায় ভাসিয়ে দেওয়া কেন নির্বাচনের মুখে! এই চক্রান্ত উন্মোচিত হয়ে যায় গুজরাটের বর্তমান বিরোধী দলপ্রধান শক্তি সিং গোয়েলের আচরণে। তিনি বলেছেন, গুজরাটে কচ্ছ এলাকার পরেই হলো পাকিস্তান। ১৮টি জেলাকে ছুঁয়ে আছে এক হাজার ছয়শো চল্লিশ কিলোমিটার উপকূলীয় এলাকা। ১০টি পুলিশ স্টেশন থাকার কথা, আছে মাত্র একটি। উপকূলীয় আউটপোস্ট থাকার কথা ৪৬টি ও কার্যকরী ভাবে আছে মাত্র ১৪টি। সত্যিই খুব চিন্তার কথা। কিন্তু ২০০৮ সালে মুম্বই হামলা হল তখনই তো এই গাফিলতির কথা তুলে ধরে নরেন্দ্র মোদীর অপদার্থতা তুলে ধরা যেত— কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেত। কিন্তু আজ ছয় বছর পরে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের জন্য সিন্দের সঙ্গে ব্যাখ্যা করবেন বলছেন কেন? কারণ মুশারফ সাহেবের বইকে কাজে লাগিয়ে এক ঢিলে দুই পাখি--- নরেন্দ্র মোদী ও আর এস এস-কে মারার ফন্দি। যেহেতু বইটিতে নরেন্দ্র মোদী, আদবানীর নাম উল্লেখ আছে, বিজেপি-র পক্ষ থেকে এর কৈফিয়ত চাওয়া উচিত। ব্রাহ্মণ্যবাদ বলে যা রঙ চড়িয়ে বলা যেত এক ঐতিহাসিককালে বা কিছুকাল আগেও তার অবশিষ্ট কিছুই নেই স্বাধীন ভারতে, বর্তমান জীবনচর্যার এবং সামাজিক ক্রিয়াকলাপে, তবুও তাকে জোর করে এক কল্পিত বৈরী তৈরি করে বিভিন্ন স্তরে বিচ্ছিন্নতাবাদীকে উস্কে দেওয়ার এই প্রবণতাকে স্তব্ধ করতে হবে। হিন্দু সমাজের ব্যাপক ঔদাসীন্য, তথাকথিত প্রগতিশীল এবং সেকুলার শংসার প্রতি লালসা— এই সব চক্রান্তকে উৎসাহ যোগায় পরোক্ষ ভাবে, এই ধরনের বর্ণচোরা গ্রন্থকারের উদ্ভব ঘটবে। কংগ্রেস এখন এই চক্রান্তকে তীব্রভাবে কাজে লাগাতে অগ্রণী হবে কিনা এখনো না বোঝা গেলেও নির্বাচনের পর ক্ষমতায় আসুক বা নাই আসুক, তৎপর হবে। এই বিষবৃক্ষ সমূলে উৎপাটন দরকার। পাকিস্তানের সৃষ্ট সন্ত্রাসবাদকে অবলম্বন করেই কারকারেকে সরানো হয়েছে— এই হলো গ্রন্থটির লিখিত বক্তব্য। অলিখিত ভাবে বলতে চাইছে গোয়েন্দা দপ্তরই হত্যা করেছে আর এস এস-র নির্দেশে। বিজেপি কি সতর্ক??

(লেখক বাঁকুড়া খৃস্টান কলেজের পদার্থ বিভাগের প্রাক্তন প্রধান)

HRG

HINDUSTAN RING GEARS

Manufacturers of

Gears, Sprockets, Gear Box, for C.T.C. Machines &
Special GEar Boxes, Speed Reducers

Works :

188, Budge Budge Trunk Road, Maheshtalla, Dakghar,
24 Parganas (S), Kolkata - 700 141

Ph. : (033) 24926172, 24926173, Mob. : 9830022299,
Fax : 24926173, E-mail : gearboxkol1975@gmail.com

সমৃদ্ধ ভারত : গ্রাম বিকাশ—একটি ভাবনা

রবীন্দ্রনাথ পতি

গ্রাম একটি বর্ণময় ছবি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কবিতার অংশটি অপূর্ব ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে—

নমো নমো নম সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি!
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ গগন ললাট চুমে তব পদধূলি—
ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটছোট গ্রামগুলি।

মহামানবের সাগরতীর এই ভারতবর্ষ গ্রাম প্রধান। প্রায় সোওয়া সাত লক্ষ বা তারও যুবকদের আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, 'তোরা গ্রামে গ্রামে যা, কাজ কর।'

হাজার বছরের পরাধীনতা আমাদের সংস্কার ও ধর্ম সংস্কৃতির উপর যথেষ্ট বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। সম্পদবণ্টনেও বৈষম্যের ফলে গ্রামে সেই আত্মীয়ভাব ফিকে হয়ে যায়। গ্রামের মুক্তবিহঙ্গ মনগুলো খাঁচায় পোরা বদ্ধ পাখির মতো শেখানো বুলির কৃত্রিমতা ভরা।

স্বাধীনতার পর দেশ পুনর্গঠনের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে স্বাধীন সরকার গ্রামের কৃষিকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার প্রতি যথোচিত গুরুত্ব না দিয়ে বৃহৎ শিল্প স্থাপনের উপর জোর দিতে থাকে। আজও সেই

দেশ গড়বার জন্য অন্য কোথাও যেতে হবে না। দেশ আপনিই গড়ে উঠবে একটি একটি করে যদি গ্রাম নবরূপে উঠে দাঁড়ায়। সেই গ্রামগুলির সমষ্টি তো এই মহান দেশ।

বেশি গ্রামে এই দেশের সত্তর ভাগেরও বেশি মানুষ বাস করে। দেশ বলতে যদি দেশের মানুষকে মুখ্যত বোঝায়— তবে সে দেশ আছে গ্রামে। আমাদের এই মহান দেশকে একটি শরীর মনে করলে তার প্রাণ আছে আত্মা আছে গ্রামে। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'ভারতের প্রাণশক্তি হলো তার ধর্ম। সে ধর্ম আছে কুটীরে কুটীরে।' তাই প্রতিযোগিতা সমানে চলেছে। ইতিহাস বলে, মানবসভ্যতার সূতিকাগার হলো কৃষি ক্ষেত্র। কৃষি যেদিন সে শিখল— সে ঘর বাঁধল। জনপদ গড়ে উঠল। মানুষে মানুষে সম্পর্কের বিকাশ ঘটিয়ে সুসংহত মানবসমাজ গড়ে তুলল। তার ধর্ম— তার সংস্কৃতি গড়ে উঠল। তার জীবন জিজ্ঞাসার ধাপে ধাপে সে জীবনাদর্শ ও জীবন-দর্শনের সন্ধান পেল।

EPC (I) Pvt. Ltd.

117, B. L. Saha Road
Kolkata - 700 041
Phone :- 2403-3443, Email - epc@cal2.vsnl.net.in

Manufacturer of TEMPEST Fans

QUALITY CERTIFIED BY - ISO 9002

With Best Wishes :-

BDJ STAMPINGS INDUSTRIES LTD.

ISO 9001 : 2000 Company
8, Rai Charan Paul Lane, Kolkata - 700 046

অন্তরস্থিত পশুকে জয় করে তার ভেতরের মানুষটা জেগে উঠতে উঠতে দেবতা-ভগবান হওয়ার লক্ষ্যে ধাবিত হলো। সে সফলও হলো। এ দান গ্রাম-ভারতের। ব্যাস-বাল্মীকি, রাজর্ষি জনক, আচার্য শঙ্কর, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ— পল্লীজননীর কোলে জন্ম ও লালিত পালিত। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিস্তারের আকাশ ছিল পল্লী জীবন— প্রকৃতির মুক্ত ক্রীড়াঙ্গন। সম্পদস্বরূপ মানব কমে যাচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "চিরদিনই চীনের মতো ভারতবর্ষ পল্লীপ্রধান। নাগরিক চিত্তবৃত্তি...সেই ঘনিষ্ঠ পল্লীজীবনের গ্রন্থি কেটে দিয়েছে। তাই আমাদের মৃত্যু আরম্ভ হয়েছে ওই নীচের দিক দিয়ে।... দেশকে কোন দিক থেকে রক্ষা করতে হবে আমার তরফ থেকে এ প্রশ্নের উত্তর— আমার ওই গ্রামের কাজ। ...শিক্ষা সংস্কার এবং পল্লী

দিয়েছে। ইংরেজ প্রবর্তিত অসার 'বাবু' বানাবার শিক্ষাব্যবস্থা স্বধর্ম পালনে ও উৎকর্ষ সৃষ্টিতে উৎসাহ যোগায় না বরং বিমুখ করে তোলে।

অন্তঃসারশূন্য ডিগ্রিগত মোহ ও ভোগ বিলাসের আকর্ষণে আমরা অর্থাৎ আধুনিক প্রজন্মের মানুষরা প্রায় ভুলতে বসেছি, একদিন আমাদের দেশে পল্লীসমাজ সজীব ছিল। এই সমাজের ভিতর দিয়েই ছিল সমস্ত

গ্রামে বায়ুচালিত বিদ্যুতের ব্যবস্থা।

আমরা এবারে আজকের গ্রামের অবস্থার দিকে চোখ ফেলি। একথা বলার অপেক্ষাই রাখে না আগেকার একান্নবর্তী পরিবারগুলি আর নেই। ইংরেজ-প্রবর্তিত স্কুল আজও যে ধারায় চলছে তার ফসল হিসাবে গ্রামের যুবকেরা বিপুল সংখ্যায় শহরমুখী। কৃষিক্ষেত্র কমে গেছে। কৃষিতে নিযুক্ত মানুষের সমস্যা কি ক্রমবর্ধমান। গৃহস্থবাড়ির ছেলেরা লেখাপড়া শিখে ডিগ্রি অর্জন করে দূর শহর বা বিদেশে চাকরি করতে যাচ্ছে। গ্রামের বাড়ি ঘর ফাঁকা। বৃদ্ধ বাবা-মা জমি বাড়ি বিক্রি করার উদ্যোগ নিচ্ছেন— এ চিত্র এখন প্রচুর। ফলে গ্রামের সঞ্জীবনই আমার জীবনের প্রধান কাজ। সেখানে যাত্রা কীর্তন রামায়ণগান সব লোপ পেয়েছে। কারণ যে লোকেরা তার ব্যবস্থা করত তারা গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছে, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা এখন সে পন্থায় চলে না, তার গতি অন্য দিকে।" ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত গ্রামীণ যুবকদের শহরে চলে আসার প্রবণতাকে কটাক্ষ করে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন— "আর একটু পড়াশোনা করলেই চাষার ছেলে স্বধর্ম ত্যাগ করে গোরার গোলামি করতে দৌড়য়।"

এই 'স্বধর্ম ত্যাগ'-এর অভিশাপ জাতীয় জীবনে দুরারোগ্য ব্যাধির জীবাণু ছড়িয়ে দেশের যোগবন্ধন। আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম-কর্মের প্রবাহ পল্লীতে পল্লীতে ছিল সঞ্চারিত। দেশের বিরাট চিত্ত পল্লীতে পল্লীতে প্রসারিত হয়ে আশ্রয় পেয়েছে, প্রাণ পেয়েছে। প্রবীণ যুগের অবশ্যই সমাজ রূপান্তরিত হয়েছিল গ্রামীণ বা পল্লী সমাজে যেখানে ব্যবহারিক কৃষিবিদ্যা ও পারমার্থিক ব্রহ্মবিদ্যা দুইয়েরই চর্চা সমাজকে উৎকর্ষতার শিখরে পৌঁছে ছিল। স্বামীজী জনকরাজার কথা বলতেন— 'একহাতে লাঙ্গলের হাল অন্য হাতে ব্রহ্মবিদ্যা'। পল্লীজাত শুধু অন্ন নয়, উৎকৃষ্ট মানবসম্পদগুলিও শহরকে সমৃদ্ধ করত। শহর ও গ্রামের প্রতিযোগিতা

বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়। সহযোগিতা তথা মেল বন্ধন চাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্ব পর্যটনের সময় চীন ও রাশিয়ার গ্রামের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। জমিদারি দেখাশোনার কালে বাংলার গ্রামের অবস্থা পাঠ করেন। শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করে শান্তিনিকেতনের নিকটবর্তী গ্রামগুলির সামগ্রিক বিকাশের উদ্যোগ গড়ে তোলেন। গান্ধীজী নতুন ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রাম স্বরাজের কথা বলেন। গ্রামীণ জীবন, চরকা ও গ্রামীণ শিল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের মডেল গড়ে তোলার উপর জোর দেন। তৎকালে গ্রামীণ জীবনের জন্য বুনিয়াদি আবাসিক শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে ওঠে, ক্রমে ক্রমে সেগুলি উঠে যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ সারা ভারতে পরিক্রমণের মাধ্যমে ভারতের অন্তরাত্মাকে খুঁজে পান পল্লীজীবন ও পল্লীবাসীর মধ্যে। বিশ্বপরিক্রমার সময় তিনি আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের গ্রামের সঙ্গে পরিচিত হন। স্বামীজীর বিচারে কুটীরবাসীরাই সত্যিকারের 'নেশন'। সমাজের তলদেশে যেতে হবে, সমস্যার মূলে পৌঁছতে হবে। সমাজের তলদেশে আগুন জ্বালালে আপনি উপর দিকে উঠবে এবং ঐক্যবদ্ধ নেশন গড়ে উঠবে। গ্রামোন্নয়নের বিষয়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন--- ''জনসাধারণকে যদি আত্মনির্ভরশীল হতে শেখানো না যায় তবে জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য ভারতের একটা ক্ষুদ্র গ্রামের পক্ষেও পর্যাপ্ত সাহায্য হবে না।''

আজকের ভারতে নগরায়নের গতি দ্রুততা পাচ্ছে, কিন্তু গ্রাম জীবন ম্রিয়মান হচ্ছে। একবার পরম পূজনীয় স্বামী ভূতেশানন্দ মহারাজ এক গ্রামকর্মী সম্মেলনে বলেছিলেন, ''তোমরা গ্রামকে 'গ্রাম' রেখে শহরের সুবিধাগুলি গ্রামে আনবার চেষ্টা করো।'' 'গ্রাম রেখে' বলতে গ্রামের মুক্ত নির্মল পরিবেশ, উদারমনস্কতা, শ্রমশীলতা, পারস্পরিক আত্মীয়তাবোধে এক পরিবারযুক্ত ভাব, স্বয়ম্ভরতা প্রভৃতির কথা বলেছিলেন। আজ খুবই পরিষ্কার এক চিত্র উদ্ভাসিত হয়--- গ্রামের শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা কৃষি বা অন্যান্য গ্রামীণ বৃত্তিতে আকৃষ্ট হয় না, সকলেই চাকরি করতে চায়, তাকে যদি জমিবাড়ি বন্ধক বিক্রয় করে সর্বস্বান্ত হতে হয়, তাও আচ্ছা।

প্রচলিত স্কুল কলেজ শিক্ষা— বাবু কালচার এনেছে। দেশের প্রকৃত ইতিহাস, ধর্মসংস্কৃতি, জীবন-জীবিকার জন্য স্বয়ম্ভরতার প্রেরণা ও কৃৎকৌশল, নীতি-আদর্শ-মূল্যবোধ, সমাজপ্রীতি, দেশপ্রেম— এসব শেখার সুযোগ নেই। গ্রামীণ দারিদ্র্য মোচনের বলিষ্ঠ আয়োজন নেই। বিদ্যালয় ছুট্-এর সংখ্যা অগণিত। গ্রামপ্রধান ভারতবর্ষের প্রকৃত উন্নয়ন গ্রাম পুনর্গঠনের মাধ্যমেই সম্ভব, বৃহৎ শিল্পের পেছনে ছুটে নয়। কৃষি ও গ্রামীণ শিল্পের বিরাট কর্মক্ষেত্রেই সকলের হাতে কাজ ও সকলের মুখে অন্ন যোগানো সম্ভব। দৃষ্টান্তরূপে প্রথমে বাছাইকরা গ্রাম নিয়ে শুরু করতে হবে।

* বাছাই করার সময় অনুকূল পরিবেশ পরিস্থিতির কথা ভেবেই স্থির করতে হবে। গ্রামের সর্বস্তরের মানুষের প্রতিনিধিগণের সভায় আলোচনার ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে

Telegram :LIBRAJUT
e-mail :
cil@ho.champdany.co.in
Web : www.jute-world.com

Phone : 2237-7880 to 85
2225-1050/7924/8150
Fax : 91 (33) 2225-0221
91 (33) 2236-3754

Libra Exporters Ltd.

Manufacturers, Exporters, Importers & Commission Agents

Works :- P.O. Choudwar,
Dist. Cuttack, Odisha - 754-025
Ph (0671) 2394304, 2394356,
2394267

REGD. Off.
33, C. R. Avenue
8th Floor
Kolkata - 700 012

ADMN. Off.
G.P.O Box 2539,
25, Princep Street,
Kolkata - 700 072

স্বামীজীর ধ্যানের ভারত গড়ে তুলতে হলে গ্রামের দিকে চোখ ফেরাতে হবে, শুধু তাই নয়, গ্রামে যেতে হবে শহরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে। গ্রামের মানুষদের সংগঠিত করতে পারলে প্রয়োজন মতো সকল কাজ তারাই করবে যদি সহানুভূতি, সহযোগিতা পায়।

সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

* প্রথমত, গ্রামবাসীগণের সভায় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সাধ্যায়ত্ত কর্মপরিকল্পনা স্থির হবে। কর্মপরিকল্পনার এলাকাভুক্ত হবে : নীতিশিক্ষা, মাছচাষ গোপালন প্রভৃতিসহ গ্রামীণ কুটীর শিল্প, ক্ষুদ্রব্যবসায়, স্বাস্থ্য- স্বাস্থ্যবিধান- পরিবেশ প্রভৃতি।

* এছাড়া গ্রামের রাস্তাঘাট, পানীয় জল, নিকাশী ব্যবস্থা, চিকিৎসার সুযোগ, সংস্কৃতিকেন্দ্র, বিদ্যালয় প্রভৃতির সুব্যবস্থায় স্থানীয় পঞ্চায়েত এর সঙ্গে যোগাযোগ ও সহযোগিতা স্থাপন ও সঙ্ঘবদ্ধ উদ্যোগ।

* গ্রামীণ কৃষি ও আর্থিক স্বয়ম্ভরতা বিষয়ে সমবায় গঠন।

* পরবর্তী পদক্ষেপ হবে গ্রামের সম্পদ মানচিত্র প্রস্তুত করা— এ বিষয়ে গ্রাম সমিতি পাড়ায় বৈঠক করে সম্পন্ন করতে পারে।

* গ্রামের সম্পদ-সুযোগ-সুবিধা ও ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সামর্থ্য বিচার করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তিন বছরের পরিকল্পনা পত্রক প্রস্তুত করা। প্রথম বছরে কী করা হবে, দ্বিতীয় বছরে কী করা হবে এবং তৃতীয় বছরে কী করা হবে তা সুনির্দিষ্ট করে কবে, কোথায়, কিভাবে, কার দায়িত্বে এবং কার বা কাদের সহযোগিতায় পরিকল্পনা রূপায়িত হবে স্থির করা।

* সকল কাজই যে গ্রামের বা যে পাড়ার কাজ তাদের দায়িত্ব নিয়েই সম্পাদন করতে হবে। বাইরের সাহায্য নিতে হতে পারে। কিন্তু উদ্যোগ ও সক্রিয়তা নিজেদেরই হবে।

* ভারতের গ্রামগুলি যদি কৃষি, কৃষিভিত্তিক শিল্প ও ব্যবসায় (যেমন : ধানচাষ, সব্জি চাষ, তৈলবীজ ও ডাল শস্য চাষ, গো-পালন, মুরগী পালন, মৎস্য চাষ, ছাতু চাষ ও প্রক্রিয়াকরণ, মৌমাছি পালন, ফল ও সব্জি প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ, জৈব সার তৈরি বস্ত্র তৈরি, গৃহনির্মাণের সামগ্রী তৈরি প্রভৃতি শিল্প ও ব্যবসায় ভেষজ চাষ ও ব্যবহার, বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি স্থান অনুযায়ী নির্বাচন করে)-এর মাধ্যমে প্রতি হাতে কাজের ব্যবস্থা ও প্রতিমুখে অন্নের ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা সম্ভব হয়--- গ্রামীণ যুবক-যুবতীদের শহরে পালিয়ে যাওয়ার প্রবণতা কমবে। অবশ্য এজন্য পরিপূরক এবং অনুপূরক কিছু শিক্ষা ও শিক্ষণ কর্মসূচি রূপায়িত করার প্রয়োজন আছে।

* গ্রামে রাস্তাঘাট এখন অনেকটাই উন্নত। বিদ্যুৎ প্রায় সব গ্রামে পৌঁছে গেছে। দূরভাষের প্রশ্নই ওঠে না। দূরদর্শনও ঘরে ঘরে। তবে সবই ভোগের কাজে লাগছে। শিক্ষা ও সৃষ্টিমূলক অর্থাৎ উৎপাদনশীল কাজে লাগে না। মানসিকতা গড়ে তুলতে যুবকদের জন্য মিলন কেন্দ্র গ্রামেই গড়ে তুলতে হবে। সেইসঙ্গে করতে হবে তথ্যকেন্দ্র, সংবাদপত্র এবং ভারত সংস্কৃতি চর্চা ও স্বল্প সময়ের নির্মল বিনোদন ব্যবস্থা। এর দায়িত্ব থাকবে যুবকদের উপর।

* গ্রামে একটি খেলাধুলার জায়গা থাকবে যেখানে ছাত্র-যুবক এবং একধারে বা অন্যস্থানে শিশু উদ্যান গড়ে তোলা দরকার।

* গ্রামের বা কয়েকটি গ্রামকে গুচ্ছ করে গড়ে তুলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি মিলিত ভাবে বিশেষ দিনগুলি উদ্যাপন ও গ্রামোৎসবের আয়োজন করবে। সহভোজন, প্রদর্শনী, গ্রামগৌরব সম্মান প্রদর্শন, বিশেষ ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন গ্রামীণ মানুষদের উৎসাহ ও আগ্রহ বাড়ায়।

* একটি গ্রাম থেকে অন্য একটি সমপর্যায়ভুক্ত গ্রামে ভ্রমণ দারুণ শিক্ষামূলক হয়।

* মাতৃমণ্ডলীর সাপ্তাহিক আসরে রামায়ণ মহাভারত আলোচনা, সন্তান মানুষ করা, তাদের ভাল সংস্কার দিয়ে যাওয়া, নিজেদের সঞ্চয় করা প্রভৃতি পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গড়ে তোলা প্রতিটি গ্রামে খুবই কার্যকর। তবে পঞ্চায়েত বা অন্য কোনোভাবে আর্থিক অনুদানের লোভে নয়, তাতে স্বয়ম্ভরতার প্রেরণা জাগে না।

* উদ্যানবিদ্যা, ভারতীয় জীবনধারা, ভেষজ চাষ ও ব্যবহার, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও জল সচেতনতা, আয়কারী অন্য কোনো উপযোগী কাজের জন্য স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণবর্গ আয়োজন করা, যুব সম্মেলন আয়োজন করা যেতে পারে।

* আজকের শিক্ষাব্যবস্থাকে কেরিয়ার গঠনের শিক্ষা বলা হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য চরিত্র তৈরি করা, মানুষ তৈরি করা। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন— Man making is my mission তিনি দেশ পুনর্গঠনের প্রথম কাজ হিসাবে তাঁর নির্দেশ man making and character building. প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় এই mission-এর অনুপস্থিতি প্রকট। তাই পাশাপাশি নীতিশিক্ষার সাপ্তাহিক ক্লাস চালাতে হবে। সেখানে নতুন প্রজন্ম দেশের বৈভবের ধারণা পাবে, সমাজবোধ দেশপ্রেম, মূল্যবোধ তার মধ্যে সৃষ্টি হবে। গ্রামে এর জন্য অবশ্য সাপ্তাহিক আসর চালাতে হবে। এই আসরের মাধ্যমে ও যুবকেন্দ্রের মাধ্যমে কর্মীদল গড়ে উঠবে। তারা নিজেরাই নিজেদের কাজ ভাগ করে দায়িত্ব নেবে।

* গ্রামের সকল কাজই গ্রামবাসীদের সভায় গড়ে ওঠা গ্রামসমিতির দায়িত্বেই সংগঠিত হবে।

* কৃষি সম্পর্কে বেশি ভাবতে হবে, কারণ সকল পরিবারে অন্ন সংস্থানের নিশ্চয়তার আশ্বাস চাই। গ্রামে শ্রমশীল মানুষের সংখ্যা এককালে বেশি থাকলেও আজকে ক্রমশ কমে যাচ্ছে। কৃষিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগের ব্যবস্থা করলে ও একইরকম শস্যের বদলে প্রকৃতির বৈচিত্র্য অনুযায়ী শস্য বৈচিত্র্য আসলে যুবকদেরও আগ্রহ বাড়বে। এর জন্যও একটি সহায়তা কেন্দ্র গ্রামে থাকবে। এ বিষয়ে আগ্রহী ব্যক্তিরা এর দায়িত্বে থাকবে।

স্বামীজীর ধ্যানের ভারত গড়ে তুলতে হলে গ্রামের দিকে চোখ ফেরাতে হবে, শুধু তাই নয়, গ্রামে যেতে হবে শহরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে। গ্রামের মানুষদের সংগঠিত করতে পারলে প্রয়োজন মতো সকল কাজ তারাই করবে যদি সহানুভূতি, সহযোগিতা পায়। রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী, আই আই টি খড়্গপুর প্রভৃতি বহু সংস্থা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে বসে আছে। চাইলেই তারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে।

দেশ গড়বার জন্য অন্য কোথাও যেতে হবে না। দেশ আপনিই গড়ে উঠবে একটি একটি করে যদি গ্রাম নবরূপে উঠে দাঁড়ায়। সেই গ্রামগুলির সমষ্টি তো এই মহান দেশ।

পল্লীপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি—

“ফিরে চল্ মাটির টানে—
যে মাটি আঁচল পেতে
চেয়ে আছে মুখের পানে।”

(লেখক রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ, নরেন্দ্রপুর-এর গ্রামপুনর্গঠন কর্মসূচির সঙ্গে চার দশকেরও বেশি কাল যুক্ত।)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

শক্ত ভারত সমৃদ্ধ ভারত : ভারতের ভবিষ্যৎ বিদেশনীতি

ড. বেদপ্রতাপ বৈদিক

গত দশ বছরে কংগ্রেস সরকারের বিদেশনীতির কোনো সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি চোখে পড়েনি। বিদেশনীতির মূল নির্মাতা এক কথায় প্রধানমন্ত্রীই হয়ে থাকেন। তা রূপায়ণের দায়িত্ব থাকে বিদেশমন্ত্রীর ওপর। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংহের বিদেশ বিষয়ক জ্ঞান এত নেই যা যে কোনো এম এ পাঠরত ছাত্রের থাকে। একথা আমি আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি।

নরসিংহ রাও এবং অটলবিহারী বাজপেয়ী এরকম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন যাঁরা বিদেশনীতি নিজেরাই নির্মাণ করতেন। এঁরা দু'জনেই বহুদিন পর্যন্ত বিদেশীমন্ত্রীর পদে থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করে একজন দক্ষ রাজনীতিজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন। দু'জনেই নিজের নিজের কালখণ্ডে বিদেশনীতিতে এমন ইতিবাচক কার্যসাধন করেছিলেন তা প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং এঁদের থেকে দ্বিগুণ সময় পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী পদের 'শোভা' বৃদ্ধি করেও করতে পারেননি। যার উল্লেখ ঐতিহাসিকগণ গর্বের সঙ্গে করতে পারেন। তিনি এমন বিদেশমন্ত্রী মনোনীত করেছিলেন যিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘে ও বিভিন্ন দেশে ভারতকে হাসির পাত্রে পরিণত করেছিলেন।

ভারতের আগামী প্রধানমন্ত্রী যিনি হবেন তাঁকে বিদেশনীতির বিষয়ে এখন থেকে সজাগ থাকতে হবে। সর্বপ্রথম ভারতের প্রতিবেশীগুলির মানসিকতা পরিবর্তন করা প্রয়োজন। পাকিস্তান সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। পাকিস্তানে নওয়াজ শরীফ সরকারের রকমসকম খুব বিপজ্জনক। স্বয়ং পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে লড়ছে ভারতের থেকে বেশি। সন্ত্রাসবাদীরা শুধুমাত্র বন্দুকের ভাষা বোঝে। যদি ভারত ও পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এক হয় তবে শুধু পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীই নয়, তালিবানি আফগান সন্ত্রাসবাদেরও মোকাবিলা করা যেতে পারে। আফগানিস্তান থেকে আমেরিকার সৈন্য চলে যাওয়ার পর একা পাকিস্তান বা ভারত তাদের মোকাবিলা করতে পারবে না। ভারত সরকারের কাজ শুধুমাত্র ঢপবাজি। কোনোরকম কার্যকরী সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নেই। আফগান রাষ্ট্রপতি হামিদ কারজাই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে নানারকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, কিন্তু আমাদের 'বাবু সরকার' ও 'বাবুগিরি নেতৃত্বে'র শুধুমাত্র সাহস ও দূরদৃষ্টির অভাবই দেখা যাচ্ছে।

> ভারতের সাংস্কৃতিক গরিমা ও গণতান্ত্রিক মর্যাদার উপযোগ করে নতুন সরকার চীন-জাপান সম্পর্ককেও এক রাস্তায় আনতে পারে এবং প্রতিবেশী দেশগুলিতে প্রতিযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে সহযোগিতার নতুন পথ খুলে যেতে পারে।

এই প্রকার নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, ব্রহ্মদেশ ও বাংলাদেশের সরকার ও জনতাও ভারতের প্রতি প্রসন্ন নেই। নেপালের জোট সরকার ও বিপক্ষ মাওবাদী দলই নিজেদের রাষ্ট্র রক্ষা করতে অসমর্থ, সেখানে ভারতের সুরক্ষা তারা কীভাবে করবে? মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি ও গণতন্ত্রের যেভাবে পতন হয়েছে এবং পাকিস্তান ও চীনের যেভাবে প্রভাব বাড়ছে তা ভারতের পক্ষে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একই অবস্থা শ্রীলঙ্কার। শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের ওপর ভারতের তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থ জড়িত আছে। শ্রীলঙ্কা ও ব্রহ্মদেশে চীনের প্রভাব বাড়ায় ভারত সরকার উদ্বেগের মধ্যে আছে। দক্ষিণ এশিয় দেশগুলিতে গত দশ বছরে চীনের রবরবা বেড়ে চলেছে।

ভারতকে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন প্রতিবেশী-নীতি তৈরি করতে হবে। দক্ষিণ এশিয়ার আটটি দেশ ছাড়া ব্রহ্মদেশ ও ইরানকে যুক্ত করতে হবে। সাবেক সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের পাঁচ গণরাজ্য---

উজবেকিস্তান, কাজাকিস্তান, কিরগিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও তাজিকিস্তানকেও যুক্ত করতে হবে। এই অঞ্চলগুলি আমাদের বিশাল আর্যাবর্তের অভিন্ন অঙ্গ ছিল। এই আর্য-প্রদেশগুলি ছাড়া ১৬ তম মরিশাসও যুক্ত হতে পারে। এদের সঙ্গে মিলিত বাজার, মিলিত সংসদ, মিলিত সংস্কৃতি ও মিলিত যাতায়াত ইত্যাদি মিলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের থেকে ভালো 'একরূপ সংগঠন' গঠন করতে হবে। যদি নতুন প্রধানমন্ত্রী এই স্বপ্নকে রূপায়ণ করতে পারেন তো এই বৃহৎ ভারত পরিবারের ১.৫ বিলিয়নের অর্থাৎ ১৫০ কোটির বেশি মানুষের জীবনে এক নতুন প্রভাতের উদয় এনে দিতে পারবে। এই বিশাল ক্ষেত্রে এত বেশি পরিমাণে ধন-সম্পদ, গ্যাস-তেল, খনিজ ও মানবসম্পদ পাওয়া যাবে যে পৃথিবীর সবচেয়ে অধিক সম্পন্ন ও শক্তিশালী এলাকা তৈরি হতে পারবে। আর তা পাঁচ বছরের মধ্যেই হতে পারে। এই এলাকায় 'মহাসঙ্ঘ' নির্মাণ হতেই অনেক দ্বি-পাক্ষিক বিবাদেরও মীমাংসা হয়ে যাবে।

ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলি ছাড়া পশ্চিম ও পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি সম্পর্কে আমাদের বিশেষ চিন্তাভাবনা করতে হবে। পূর্ব এশিয়া তো ভারতের সাংস্কৃতিক প্রভাবক্ষেত্র ছিল। চীনের জনসাধারণ ভারতকে 'পশ্চিম স্বর্গ' ও 'গুরুর দেশ' বলে মনে করে। বৌদ্ধ রাষ্ট্রগুলিতে ভারতের বিশেষ সম্মান আছে। ভারত যদি মনে করে তবে পঞ্চ 'ভ'-কার কূটনৈতিক সম্পর্ক চালাতে পারে— ভাষা, ভূষা, ভোজন, ভজন ও ভেষজ। চীনের সঙ্গে সীমাবিবাদ মিটিয়ে নেওয়া কঠিন নয়। ভারত ও চীন একসঙ্গে একবিংশ শতাব্দীকে 'এশিয়া শতাব্দী'তে পরিণত করতে পারে।

ভারতের সাংস্কৃতিক গরিমা ও গণতান্ত্রিক মর্যাদার উপযোগ করে নতুন সরকার চীন-জাপান সম্পর্ককেও এক রাস্তায় আনতে পারে এবং প্রতিবেশী দেশগুলিতে প্রতিযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে সহযোগিতার নতুন পথ খুলে যেতে পারে।

আমেরিকা, রাশিয়া ও ইউরোপীয় মহাশক্তিগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বরাবরই ভাল। কিন্তু ভারত তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ে নিজের কোনো মৌলিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। সেটা লিবিয়া, মিশর, সিরিয়া বা চেচনিয়া ও ইউক্রেনের সঙ্কট বিষয়ে হোক না কেন। পরমাণু বেচা-কেনা নিয়ে মনমোহন সরকার ভারতীয় সংসদের মান-সম্মান ধুলায় মিলিয়ে দিয়েছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর সময় শুরু হওয়া প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে সম্পর্কের অভিযানও শিথিল হয়ে পড়ে আছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যপদ নবীকরণের শেষ পর্যন্ত কবে হবে? সমাজবাদ ও পুঁজিবাদ দুটোই ধরাশায়ী হয়েছে— এ অবস্থায় ভারত শুধু ভাবতেই থাকবে? আন্তর্জাতিক সমাজকে এরকম বৈকল্পিক ব্যবস্থার পরামর্শ দিতে পারে না— যা সারা পৃথিবীর পরিমণ্ডল ও মানবজীবনে নতুন আশার সঞ্চার করতে পারে!

(লেখক ভারতের বিদেশনীতি পরিষদের সভাপতি)

মোদীর বক্তৃতার সম্মোহন হিন্দুর হকের পাওনা, গুজরাটের উন্নয়ন আর বিরোধীদের ভুলগুলিকে চিহ্নিত করে দেওয়ারই সমাহার

অতিথি কলম

চেতন ভগত

সত্যিই রাজনীতির ময়দানে মাঝে মঝেই বেশ কিছু বর্ণময় রাজনীতিকদের দেখা মেলে— শ্রী নরেন্দ্র মোদী অবশ্যই তাঁদের মধ্যে অন্যতম। অন্যদিকে গত ১২ বছর ধরে এমন এক বিতর্কিত রাজনীতিকের উত্থানও নজরকাড়া । দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একজন রাজনীতিকের ওপর ব্যক্তি-আক্রমণ, দোষারোপ, একঘরে করা, তীব্র কুৎসা ও কুকথা যেমন নাগাড়ে ও সম্মিলিতভাবে বর্ষিত হয়েছে তা হয়ত শয়তানের ক্ষেত্রেও সচরাচর ঘটে না। তবু তিনি শুধু টিকে থাকেননি, রাজনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হয়ে চলেছেন।

আজ পরিস্থিতি এমন যে মানুষ অবাক হয়ে যাবে যদি না তিনি ২০১৪'র নির্বাচন জেতেন। 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' চরিত্রের সম্ভাব্য সহযোগী দলগুলি ভেতরে ভেতরে তাঁর কাছে চর পাঠাচ্ছে। অথচ গোধরা কাণ্ড সম্পূর্ণ মিলিয়ে গেলেও তাকে কবর থেকে তুলে এঁরাই সমালোচনার তোড়ে মোদীকে ভাসিয়ে দিতে চাইছেন। ইতিমধ্যে গুজরাটের লাগাতার উন্নয়নের মধ্যে ছিদ্র খুঁজে বার করার জন্য বিশেষজ্ঞরা প্রায় একটি নতুন শিল্প উদ্যোগই খুলে ফেলেছেন। তাঁরা কায়মনোবাক্যে গুজরাটের কোন জায়গাটি সব থেকে জঘন্য তা প্রায় উন্মাদ হয়ে খুঁজে ফিরছেন।

> **গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান সম্ভবত মোদীর অনুকূলে সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে। এ সবই হয়ত তাঁর নিজের ও তাঁর দলের যৌথ প্রচেষ্টার ফল হতে পারে। এটি আবার বরাতজোরও হতে পারে কিম্বা আমাদের হিন্দু ধর্মে যা বলে থাকে সেই 'বিধাতার লিখন'। যে যেভাবে নেবেন।**

যেমন ধরুন, হন্যে হয়ে ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা অজস্র স্কুলের মধ্যে এমন একটি পেলেন যেখানে তুলনামূলকভাবে হয়ত শিক্ষক সংখ্যা কম বা একটি হাসপাতাল যেখানে অর্থের যোগান হয়ত প্রয়োজন মাফিক নয়। ব্যস, তাঁরা আবিষ্কারের আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে বলে উঠলেন, ‘‘দেখ তোমাদের গুজরাট কি ভয়ঙ্কর।’’ হায়! এই বিশেষজ্ঞরা ভুলে যাচ্ছেন গুজরাট ভারতেরই একটি অংশ আর ভারতের রাজ্যগুলি এখনও মূলত কেন্দ্রের টাকা, অনুদান, ভর্তুকি ইত্যাদির ওপর বেশ খানিকটা নির্ভর করেই চলে। কেন্দ্রই অধিকাংশ প্রকল্পের অনুমোদন ও মূলধন নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। একটা জগাখিচুড়ি গুজরাট বা অগ্রসরমান গুজরাট দু'টোর কোনোটাই ১০০ শতাংশ রাজ্যের ওপর নির্ভর করে না।

গুজরাট, মোদী ও বিশেষত্ব :

যাই হোক, গুজরাট এক মহাবিস্ময়কর রাজ্য হোক বা না হোক, মোদীর রাজনৈতিক-গ্রাফ যে ক্রম ঊর্ধ্বমুখী সে বিষয়ে তিলমাত্র সংশয় নেই। এমনকী যিনি নাকি সদাই সঠিক পথে থাকেন কিন্তু প্রায়শই বেঠিক কথা বলে থাকেন সেই অরবিন্দ কেজরিওয়ালও হালফিল গাদকারী, আম্বানী রবার্ট বঢরা বা শীলা দীক্ষিতের সুনাম নিয়ে ছিনিমিনি খেললেও নরেন্দ্র মোদীর নিষ্কলঙ্ক ভাবমূর্তি ও প্রভাবের ওপর দাঁত ফোটাতে পারেননি।

তাহলে এটা কেমন করে হলো? এটা কি শুধুই মোদীর উন্নয়নের এজেন্ডা? না কি বিরোধীরা দুর্বল, না কি মোদীর দুর্দান্ত ভাষণ দেওয়ার মুন্সিয়ানা ও প্রবল ব্যক্তিত্ব? না কি চোখে দেখা না গেলেও বাড়াবাড়ি রকম হৈ হৈ না করলেও তাঁর মধ্যে অন্তর্লীন হিন্দুত্বের স্রোতধারা। কোনটা ঠিক? গোয়ার মনোহর পারিক্কর, মধ্যপ্রদেশে শিবরাজ চৌহান— রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে এঁদের সকলেরই সুনাম ও প্রতিষ্ঠা রয়েছে। তাহলে ওই মোদীকে নিয়েই সারা দেশব্যাপী তাঁর সমর্থকদের এমন তুমুল আবেগ ও উন্মাদনার জোয়ার কেন? এই প্রশ্নটির উত্তর অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে বিজেপি-র পক্ষে। যতই হোক না কেন মোদী-ঢেউয়ে ভর করে তারা

এখনও পুরোপুরি তীরে উঠতে পারেনি। প্রসঙ্গত মোদী সারা দেশে যে স্থায়ী সরকারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পৌঁছতে গেলে বিভিন্ন নির্বাচনী সমীক্ষার ঘোষিত ফলাফলের থেকে আরও অন্তত ২০টি আসন বিজেপি-কে বেশি পেতেই হবে।

অন্যদিকে মোদীর বিরোধীদেরও তাঁর এই জনপ্রিয়তার রহস্য জানা জরুরি। নজর করলে দেখবেন বিরোধীরা তাদের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে এখনও পর্যন্ত তাঁর যতটা না ক্ষতি করতে পেরেছে তার চেয়ে সুবিধে করে দিয়েছে বেশি। মোদীর সমালোচনা আজকাল যেন মনে হচ্ছে তাঁকে আরও ঝলমলে করে তুলেছে। সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে মোদীর আকর্ষণের কুহক ভেদ করতে পারলে ভারতীয় হিসেবে আমরাই হয়ত আমাদের সঠিক ভাবে চিনতে পারব।

অনেকেই হয়ত এড়িয়ে গেছেন বা ইচ্ছে করেই নজর দেন না একটা বিষয়ে। সেটা হলো হিন্দুদের অধিকারবোধ বা তাদের হক। ব্যাপারটা বরাবরই বেশ নিচু পর্দায় বাঁধা। অবশ্যই আমাদের সংবিধান ও আইনিব্যবস্থা ধর্মনিরপেক্ষ। আমাদের নাগরিক সমাজের নানান তর্কক্ষেত্রে কোনো সাম্প্রদায়িকভিত্তিক আলোচনা পরিচালনা করা হয় না। এটি নিশ্চয় কাম্য। কিন্তু মনে রাখতে হবে আলোচনায় এল না বলেই হক বা দাবিটি রইল না এমন নয়।

হিন্দু কল্পনা ও মোদী :

সারা বিশ্বের হিন্দুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় বসবাসকারী রয়েছেন এই ভারতে। লোকসংখ্যার ৮০ শতাংশের যে বিপুল হিন্দু গরিষ্ঠাংশ তাদের সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতাজনিত অধিকারবোধকে তো সহজে বিনষ্ট করা যাবে না। যে অধিকারবোধের মধ্যে দোষের কিছু পাওয়া যায় না। এখন এর সঙ্গে যোগ হয়েছে কংগ্রেস দলের মুসলমানদের নিয়ে ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির চিরাচরিত কৌশল। কংগ্রেস সব সময় মুসলমান সংক্রান্ত ইস্যুগুলিকে বড় করে দেখে। এই বৈষম্যমূলক সরকারি আচরণই হিন্দুদের ক্ষোভকে আরও বাড়িয়ে দেয়।

আর ঠিক এখানেই রহস্যের চাবিকাঠি। এমন একজন নেতা যাঁকে দেখলে হিন্দুরা গর্ববোধ করতে পারে, তার আত্মমর্যাদায় তৃপ্তি আসে, তাই তাকে ঘিরে সংখ্যাগরিষ্ঠের আবেগ স্বাভাবিক ফলশ্রুতি। আর ঠিক এই কারণেই বেশিরভাগ মানুষ গোধরা কাণ্ড নিয়ে মোদীকে বিচার করার মধ্যে কোনো যৌক্তিকতা খুঁজে পান না। প্রথমত মোদীর ভূমিকা নিয়ে কেউই নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেনি, আবার আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণিত নয়। এক ধরনের মানুষের কাছে এ ঘটনা শঠে শাঠ্যং বলেই মনে হয়।

দ্বিতীয়ত এই রকম মতামতের ক্ষেত্রে অবশ্যই এটা মানা হয় না যে— মুসলমানরা সবরমতী এক্সপ্রেসে আগুন দিয়েছিল ও নানান সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম চালায় তাদের সঙ্গে গুজরাট দাঙ্গায় মারা পড়া নিরীহ মুসলমানদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু আমরা তো জানি আবেগ বেশিরভাগ সময়ই যুক্তিকে মানে না আর তাই দীর্ঘদিনের বঞ্চিত হিন্দু সমাজের গরিষ্ঠাংশ মোদীকে যদি কিছু ঘটেও থাকে তার জন্য বহুকাল আগেই ক্ষমা করে দিয়েছে। আবার বলছি এটা উচিত কি অনুচিত বা ন্যায়সঙ্গত বা অন্যায় এ সম্পর্কে আমি কোনো রায় দেব না, তবে ঠিক এমনটাই ঘটেছিল।

তৃতীয়ত মানুষের প্রত্যাশা আকাঙ্ক্ষাকে বশ করবার ক্ষমতা মোদীর অধিগত। তিনি গুজরাটে নিরন্তর কাজ করে গেছেন যতক্ষণ কিছু কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় না পৌঁছোচ্ছেন। অবশ্যই গুজরাট হয়ত একটি আদর্শ রাজ্য নাও হতে পারে তবে রাজ্যটি নানান মানদণ্ডে অন্য অনেক রাজ্যের থেকে এগিয়ে আছে। সবচেয়ে বড় কথা মোদী গোড়া থেকেই 'হ্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা' গালভরা প্রতিশ্রুতি দেননি। তিনি কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে কিছু অর্জন করেছেন, তারপর নিজেকে প্রকাশ্যে তুলে ধরেছেন।

চতুর্থত, তাঁর ব্যক্তিত্ব। এটি আমাদের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের ঠিক ১৮০ ডিগ্রি বিপরীত। মোদী সোজা কথা বলেন আর লোকে যেটা পচ্ছন্দ করে। মানুষ এমন একজনকেই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চায় যার নির্দিষ্ট মতামত আছে, সেটি নাই বা হলো একবারে কেতাবি ঢঙের বা ধোপদুরস্ত। মোদীর যে নিশ্চিত রসবোধ রয়েছে সেটি কখনই তাঁর ক্ষতি করে না। এর ফলে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ সুবিধেজনক হয় আর বক্তব্যও হয় সহজবোধ্য। এমনকী যদি তা বহুশ্রুত 'শাহেজাদা' বা 'বোবা প্রধানমন্ত্রী'র ব্যাঙ্কে টাকা থাকলেও মানুষ তা উপভোগ করেন।

পাঁচ নম্বরে রয়েছে বাস্তববাদিতা। সারা দেশের মানুষ তাঁর অবিসম্বাদিত শত্রুদের চেনে যেমন দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, বংশবাদ, নারী নির্যাতন এমনি সব হাজারো চিহ্নিত অচিহ্নিত বৈষম্য যার মধ্যে রয়েছে। তারা এও জানে এগুলিকে রাতারাতি নির্মূল করা সম্ভব নয়। অবস্থার পরিবর্তন হয় তবে ধীরে এবং সময় ধরে। এই কারণে দেশ এক বিশাল আদর্শের ধ্বজাধারী ঋষিকল্প কোনো নেতার সন্ধানে নেই, তারা চাইছে সমাজের এই নানান ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থাকে কিছুটা বাগে আনার মতো একজনকে।

শেষ বিচারে মোদী সাদাসিধে ও অকপট এবং ভাগ্যবান। রাহুল গান্ধী মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে অবশ্যই দুর্বল। হায়! টিভিওয়ালারা পর্যন্ত ভোটের বাজারে একজন জবরদস্ত টক্করদেনেওয়ালা খুঁজে পেতে হয়রান হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য কেজরিওয়াল তাদের মাঝে মাঝে কিছু খোরাক দিচ্ছেন। কেলেঙ্কারিতে গজগজে ইউপিএ সরকারের এক দশকের কাজকর্মে মানুষ আজ বিমর্ষ। এই প্রেক্ষিতে কংগ্রেসী নেতাদের ঔদ্ধত্য সব ধৈর্য ভেঙে দিয়েছে। ঠিক এই কালপর্বেই আবির্ভাব হয়েছে মোদীর, যখন মানুষ বদলের ভাবনায় উন্মুখ।

মোদ্দা কথায় আমরা হয়ত সঠিক জানি না নির্বাচনে কি হতে যাচ্ছে। তবে গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান সম্ভবত মোদীর অনুকূলে সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে। এ সবই হয়ত তাঁর নিজের ও তাঁর দলের যৌথ প্রচেষ্টার ফল হতে পারে। এটি আবার বরাতজোরও হতে পারে কিম্বা আমাদের হিন্দু ধর্মে যা বলে থাকে সেই 'বিধাতার লিখন'। যে যেভাবে নেবেন।

(লেখক একজন খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক)

শক্ত ভারত ও স্থায়ী সরকার

বিজেপি ও জোট রাজনীতির নতুন অধ্যায়

অম্লানকুসুম ঘোষ

কর্মজগতের যে-কোনো ক্ষেত্রেই একের চেয়ে বহুর সাফল্য- সম্ভাবনা বেশি থাকে। অর্থাৎ সঙ্ঘবদ্ধভাবে বা জোটবদ্ধভাবে কোনও কাজ করলে তা সফল হবার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। রাজনীতিক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। এককভাবে নির্দল ব্যক্তির চেয়ে অনেক ব্যক্তির দ্বারা গঠিত দলের সাফল্য-সম্ভাবনা বেশি থাকে। আবার একটি দলের তুলনায় বেশ কয়েকটি দলের জোটের সাফল্য সম্ভাবনা অনেক বেশি হয়।

তত্ত্বগত বিশ্লেষণে আবদ্ধ না থেকে একটু বাস্তব উদাহরণে যাওয়া যাক। ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রে জোট রাজনীতির ইতিহাস বেশ পুরোনো। ১৯৬৭-র বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে প্রজা স্যোসালিস্ট পার্টি (পিএসপি), কমিউনিস্ট পার্টি-সহ মোট পাঁচটি দলের জোট হয়েছিল। ফলস্বরূপ সেবার বিধান রায়ের নেতৃত্বাধীন শাসক কংগ্রেস দল ১৯৫২'র চেয়ে ৯ শতাংশ ভোট বেশি পেলেও (১৯৫২—৩৮ শতাংশ, ১৯৫৭—৪৭ শতাংশ) আসন অনেক কম পেয়েছিল। পাশাপাশি লোকসভা নির্বাচনে জওহরলালের আমলে কোনও রকম বিরোধী জোট না হওয়ায় ১৯৫২, ১৯৫৭, ১৯৬২ এই তিনবারই কংগ্রেস ৫০ শতাংশের অনেক কম ভোট পেয়েও তিনবারই সত্তর শতাংশেরও বেশি আসন জিতেছিল। জোট রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রথম ঐতিহাসিক সাফল্য অবশ্য আসে ১৯৭৭ সালে ইন্দিরা গান্ধীর ইমারজেন্সির বিরুদ্ধে, জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে প্রায় সবকটি প্রধান বিরোধী দল 'জনতা দল' নামে একত্রিত হয়। জোট রাজনীতির এই সফল রূপায়ণে ইন্দিরা গান্ধীর একনায়কতন্ত্র অন্তত কিছুদিনের জন্য হলেও অস্তাচলের পথে গেছিল। জোট-রাজনীতির ধারাবাহিকতা অবশ্য দেখা গেছে ১৯৮৯ সালের পর থেকে। ১৯৮৯'র পর একবারও কোনও একদলীয় সরকার কেন্দ্রে সরকার গড়েনি। এই পঁচিশ বছরে দেশে মোট দশটি জোট সরকার শাসন চালালেও ১৯৯৯-২০০৪ সালে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র জোট সরকারের মতো সামগ্রিকভাবে সফল অন্য কোনও সরকার হয়নি।

অতীতের প্রেক্ষাপটে এবার বর্তমানকে দেখা যাক। লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে এই মুহূর্তে এটা পরিষ্কার যে একক দল হিসেবে বিজেপি'ই এবার সর্ববৃহৎ হবে। তবু জোট রাজনীতির স্বার্থে সদর্থক জোট গড়া অগ্রণী রাজনৈতিক দল হিসাবে বিজেপি'র কর্তব্য। সেই কর্তব্য বিজেপি কতটা এবং কীভাবে পালন করছে একটু রাজ্যওয়াড়ি বিশ্লেষণে দেখা যাক।

বিজেপি-র আপাত দুর্বল জায়গা দক্ষিণ ভারত থেকেই শুরু করা যাক।

বিজেপি'র নতুন জোটসঙ্গী

চন্দ্রশেখর রাও

রামবিলাস পাসওয়ান

আলাগিরি

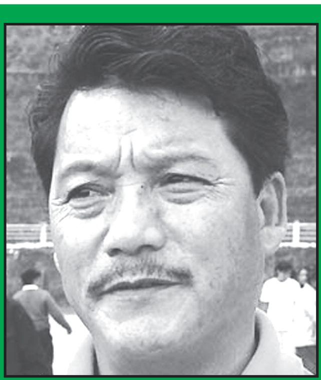

বিমল গুরুং

আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও বিজেপি জোট রাজনীতির ক্ষেত্রে নীরব অগ্রগতির নিদর্শন রেখেছে। উত্তরবঙ্গে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা, কে পি পি ও আদিবাসী বিকাশ পরিষদ এই তিন যুযুধান পক্ষকে এনডিএ-র এক ছাতার তলায় নিয়ে এসেছে বিজেপি।

তামিলনাড়ুতে বিজেপি এবার জোট রাজনীতির ক্ষেত্রে এক অভিনব পরীক্ষা করেছে। এযাবৎ কাল তামিলনাড়ুতে যে-কোনো জোটই আবর্তিত হয়েছে 'ডি এম কে' ও 'এডিএমকে' এই দুই আঞ্চলিক বড় দলকে কেন্দ্র করে। বিজেপি ও কংগ্রেস এই দুই জাতীয় দলও পর্যায়ক্রমে করুণানিধি ও জয়ললিতার সঙ্গে রাজনৈতিক বন্ধুত্বে আবদ্ধ হয়েছে। প্রাদেশিক অন্যান্য ছোট দলগুলিও এই দুই মেরুর অনুগামী হয়েছে প্রয়োজন অনুসারে। এবারই প্রথম বিজেপি তামিলনাড়ুর অন্য ছোট দলগুলির সঙ্গে জোট বেঁধেছে, মোট পাঁচটি দলের সঙ্গে বিজেপি'র জোট হয়েছে। এছাড়াও ডিএমকে'র বিদ্রোহী নেতা আলগিরি'র সমর্থনও এবার বিজেপি'র দিকে। অপরদিকে কংগ্রেস, এডিএমকে ও ডিএমকে এই তিন দলই এবার তামিলনাড়ুতে আলাদাভাবে লড়ছে। ফলে আশা করা যায় স্বল্পশক্তির হলেও জোটবদ্ধ এনডিএ এবার তামিলনাড়ুতে ভাল ফল করবে। তাছাড়া দুর্নীতির জন্য ডিএমকে'র থেকে যে ভোটররা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাদের বড় অংশ আরেক দুর্নীতিগ্রস্ত জয়ললিতার অনুগামী না হয়ে এবার আলাগিরির অনুগামী হয়ে এনডিএ'র দিকেই আসবে। অর্থাৎ এই প্রথম তামিল রাজনীতিতে ত্রিমুখী লড়াই দেখা যাবে।

বিভক্ত অন্ধ্রপ্রদেশের দুই অংশ অর্থাৎ তেলেঙ্গানা ও সীমান্ধ্র এই দুই প্রদেশেই এবার জোট গঠনে বিজেপি আশাতীত সফল, পাশাপাশি কংগ্রেস চূড়ান্ত ব্যর্থ। ভোটের মুখে তেলেঙ্গানা গঠন করে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার নেশায় মশগুল কংগ্রেস 'পোয়েটিক জাস্টিস' পেয়েছে অচিরেই। সীমান্ধ্রে মুখ্যমন্ত্রীসহ তাদের প্রায় পুরো দলই আজ হস্তচ্যুত, অপরদিকে তেলেঙ্গানায় টি আর এস-ও তাদের সঙ্গে জোটে অরাজি। পাশাপাশি চন্দ্রবাবু নাইডুর নেতৃত্বাধীন টিডিপি সম্প্রতি এন ডি এ-তে সামিল হয়েছে। তেলেঙ্গানায় টি আর এস-এর সঙ্গে জোট গড়েছে বিজেপি। অতএব বলা যায় এই দুই রাজ্য থেকেই বিজেপি এবার বেশ কিছু আসন পাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। দক্ষিণ ভারতের তিন রাজ্যে এই নবগঠিত জোট সমূহ শুধুমাত্র এনডিএ-কেই নবকলেবর দান করবে তাই নয় বরং বিজেপি'র আপন কলেবর বৃদ্ধিতেও সহায়ক হবে। এ ব্যাপারে দাক্ষিণাত্যের আরেক রাজ্য কর্ণাটকের উদাহরণ স্মর্তব্য। কর্ণাটকে এক সময়ের অস্তিত্বহীন বিজেপি রামকৃষ্ণ হেগড়ের লোকশক্তির সঙ্গে জোট গড়েছিল, কালক্রমে সেই প্রাদেশিক দল বিজেপি'র অঙ্গীভূত হয়ে বর্তমান বিজেপি'কে কর্ণাটকের বৃহত্তম দলে পরিণত করেছে। সীমান্ধ্র, তামিলনাড়ু ও তেলেঙ্গানার ক্ষেত্রেও সেরকম হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ বিজেপি-র নব জোটপ্রচেষ্টা শুধু বর্তমানের সম্বলই হবে না বরং ভবিষ্যতেরও পাথেয় হবে।

দেশের অন্য কিছু রাজ্যের দিকে চোখ ফেরানো যাক। বিহারে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে নতুন জোটসঙ্গী জোগাড় করার ব্যাপারে আশাতীত সফল বিজেপি। অর্থনৈতিক ভাবে পশ্চাৎপদ এই রাজ্যটিতে গত দু'দশক বিজেপি ও জেডিইউ (পূর্বের সমতা পার্টি) একত্রিতভাবে লড়াই করে লালুপ্রসাদকে ক্ষমতাচ্যুত করে শাসনক্ষমতায় আসীন হয়ে রাজ্যকে নতুন দিশা দেখানোর চেষ্টা করছিল। ২০১০ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই জোট রাজ্যের মোট আসনের ৮০ শতাংশ পেয়েছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হবার অসম্ভব উচ্চাশায় নীতিশ কুমার এবারে এনডিএ ছেড়ে বেরিয়ে যাবার পর সাময়িকভাবে সঙ্গীহীন বিজেপি অস্বাভাবিক দ্রুততায় লোকজনশক্তি ও অন্যান্য বেশ কিছু ছোট দলের সঙ্গে জোট গড়ে নীতিশকুমারের অভাব পূরণ করে ফেলেছে, আসন সংখ্যাও গতবারের চেয়ে বাড়ার সম্ভাবনা, পাশাপাশি নতুন জোটসঙ্গী জোগাড় করতে অক্ষম নীতিশ কুমার কংগ্রেসের সঙ্গলাভেও ব্যর্থ হয়ে এখন সম্পূর্ণ একা হয়ে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে নেমেছে। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিয়ে নীতিশের অনেক সহচর-ই এখন বিজেপি-র পক্ষাবলম্বন করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লালুপ্রসাদের একদা ছায়াসঙ্গী রামকৃশান যাদবও এখন বিজেপি-র আশ্রয়প্রার্থী। তাই একথা অনস্বীকার্য যে বিজেপি এবারে বিহারে সর্ববৃহৎ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

দেশের পশ্চিমপ্রান্তের রাজ্য মহারাষ্ট্রে এবার যে পরোক্ষ জোটের নির্দশন বিজেপি রেখেছে তা শুধু সেই রাজ্যে নয় গোটা দেশেই অভূতপূর্ব। গত পনেরো বছর ধরে সেখানে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস- এনসিপি জোট। চূড়ান্ত অপশাসনের ফলে বিপুল পরিমাণ অ্যান্টি-ইনকামবেন্সি ফ্যাক্টর এ রাজ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে গত এক দশক ধরেই। কিন্তু বিজেপি-র জোট শরিক শিবসেনার বিদ্রোহী অংশ মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা ও শিবসেনার ভোট কাটাকাটির ফলে গত দু'বারের লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে মহারাষ্ট্রে কংগ্রেস- এনসিপি জোট লাভবান হয়েছে। এবারও ঠাকরে ভ্রাতৃদ্বয়ের বিবাদ না মেটায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু বিজেপি মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে যে বিজেপি তাদের কোনো আসন না ছাড়লেও তারা বিজেপি-র প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কোনও প্রার্থী দেবে না। এর ফলে শিবসেনার সঙ্গে বিজেপি'র ভোট এম এন এসের দ্বারা ভাগও হচ্ছে না। ছ'মাস পরে

অনুষ্ঠিতব্য বিধানসভা ভোটের কথা মাথায় রেখে এম এন এস যে বিজেপি-র সঙ্গে এই পরোক্ষ জোট গড়েছে তার ফলে এবার মহারাষ্ট্রে কংগ্রেস- এনসিপি-র ভরাডুবি ঘটিয়ে বিজেপি-র আসন সংখ্যায় বিস্ফোরণ ঘটার সম্ভাবনা।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও বিজেপি জোট রাজনীতির ক্ষেত্রে নীরব অগ্রগতির নিদর্শন রেখেছে। উত্তরবঙ্গে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা, কে পি পি ও আদিবাসী বিকাশ পরিষদ এই তিন যুযুধান পক্ষকে এনডিএ-র এক ছাতার তলায় নিয়ে এসেছে বিজেপি। সঙ্গে বিজেপি-র নিজস্ব ভোট তো রয়েছেই। সব মিলিয়ে উত্তরবঙ্গে এবং বিজেপি-র ফলাফলে বৈপ্লবিক চমক থাকলে তা আশ্চর্যের হবে না।

তবে জোট-রাজনীতির পথে হাঁটার সময় একটি কথা সদা স্মরণে রাখা উচিত। রাজনীতির লাভের কথা ভাবতে গিয়ে নীতির পথ থেকে যেন বিচ্যুতি না ঘটে। জোটের ছোট দলগুলির সবসময়ের চেষ্টা থাকবে নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করা, কিন্তু প্রধান দল এবং দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী দল হিসেবে বিজেপি-র অবশ্য কর্তব্য হওয়া উচিত এই সব ক্ষুদ্র লক্ষ্যের বদলে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মহৎ লক্ষ্যকে সামনে রাখা। ইতিপূর্বে অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলে এনডিএ জোট-রাজনীতির সাফল্যের এক নতুন দিগন্তের সূচনা করলেও সে সময় ছোট শরিকদের অন্যায় আবদার রাখতে গিয়ে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি, ৩৭০ ধারা রদ প্রভৃতি মহান দাবিগুলি ভুলে থাকতে হয়েছিল বিজেপি-কে। অর্থাৎ লতানে পরগাছার আকর্ষিতে মহীরুহের বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। তার ফলে বিজেপি-র বিশ্বাসযোগ্যতা অনেকটা নষ্ট হয়েছিল। গত এক দশক ধরে তার ফল ভোগ করেছে বিজেপি। তাই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার বিজেপি'র উচিত নিজেদের মহান লক্ষ্যগুলি বজায় রেখে শরিকদের অন্যায় আঞ্চলিক দাবিগুলি দমন করা কূটনীতির নানান চালে। সবচেয়ে ভাল হয় যদি ভোট-পূর্ব সফল জোটের নিখুঁত রসায়নে প্রচুর আসন জিতে ভোট পরবর্তীতে শরিক নির্ভরতা কাটিয়ে ওঠে বিজেপি। তাহলে দেশের, দলের ও সাধারণ মানুষের সকলেরই মঙ্গল।

বরখাস্ত হোক সাম্প্রদায়িক বিজেপি অথবা....

মাননীয় ভি এস সম্পত
মুখ্য নির্বাচন কমিশনার
নয়াদিল্লী

স্বাভিমানী ভারত গড়ার ক্ষেত্রে আপনার এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ। দেশের সাধারণ নির্বাচনকে প্রভাবমুক্ত, অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ করার জন্য যেভাবে আপনাদের নানা উদ্যোগ নিতে দেখা যাচ্ছে তার জন্য ধন্যবাদ। এর ফলে দেশের মানুষের গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা বাড়ছে বলেই আমার ধারণা। এবং এটা বাস্তবও।

বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র হিসেবে ভারত দেশ আমাদের গর্ব। আর সেই গর্ব অক্ষুণ্ণ রাখার প্রধান সেনাপতি হিসেবে আপনাদের ভূমিকাও প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু সেই সঙ্গে কিছু নিবেদন আছে। কয়েকটি বিষয় আপনার নজরে আনতে চাই যা দেশের নির্বাচনকে প্রভাবমুক্ত করার ক্ষেত্রে প্রধান বাধা।

আপনার কাছে প্রথম প্রশ্ন বিজেপি নামক 'সাম্প্রদায়িক' দলটিকে নির্বাচন প্রক্রিয়া থেকে কেন বাদ দেওয়া হবে না?

বিজেপি সাম্প্রদায়িক। বাকিরা ধোয়া তুলসীপাতা। সুতরাং বিজেপি-কে ভোট নয়। কংগ্রেস, অকংগ্রেস, মূল কংগ্রেস, ফুল কংগ্রেস সবার ভোট প্রচারের এটাই স্লোগান। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই মনে করে বিজেপি সাম্প্রদায়িক। সুপ্রিম কোর্ট যতই নরেন্দ্র মোদীর পক্ষে রায় দিক তবু প্রচারে তাঁকে কাঠগড়ায় তোলা হচ্ছে। মাননীয় নির্বাচন কমিশনার, আপনার কাছে আমার আবেদন, নির্বাচনকে অবাধ করতে হয় এই অভিযোগ বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া উচিত অন্যথায় বিজেপি-কে বরখাস্ত করা উচিত।

বিজেপিকে যাঁরা সাম্প্রদায়িক মনে করেন তাঁদের আসলে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' নামক পবিত্র শব্দটার অর্থই জানা নেই। তাই নির্বাচনের এই মহাপরবের মধ্যেই নির্বাচন কমিশনের উচিত ভোটারদের বুঝিয়ে দেওয়া কাকে বলে সেকুলার। জানিয়ে দেওয়া উচিত কীভাবে নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ প্রমাণ করার জন্য মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষদের দেশের নাগরিক মনে না করে শুধু ভোটব্যাঙ্ক ভাবতে হয়। কীভাবে যাবতীয় অভিধানকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রমাণ করতে হয় সংখ্যালঘু এবং মুসলমান শব্দ দুটি আসলে সমার্থক। না, অন্য কোনও ধর্মের বা বিশ্বাসের মানুষ সংখ্যায় যতই কম হোক না কেন তবু এদেশের একমাত্র সংখ্যালঘু হল মুসলমান সম্প্রদায়। মাননীয় নির্বাচন কমিশন আপনারাও কি এই তত্ত্বকে সমর্থন করেন? যদি করেন তবে বিজেপি-কে এখনই বরখাস্ত করুন।

বিজেপি-র ইস্তাহার খুঁজে কোনও পৃথক ধর্মীয় বিশ্বাসের মানুষের জন্য পৃথক প্রতিশ্রুতি পেলাম না। অথচ বাকি সকলের ম্যানিফেস্টোতেই সংখ্যালঘুদের (পড়ুন মুসলমান) জন্য 'হেন করেঙ্গা তেন করেঙ্গা'র ফিরিস্তি। কিন্তু এই দেশে কি সেভাবে আলাদা করে কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য কোনও কিছু করা যায়? বাংলার মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য ইমামদের মাসে মাসে সরকারি ভাতা দেওয়ার উদ্যোগ নিয়ে সেই ধর্মনিরপেক্ষ নিয়মও তৈরি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আদালতের হস্তক্ষেপে তা সম্ভব হয়নি এখনও পর্যন্ত। যদিও আমি নিশ্চিত কোনও একটি আইনি ফাঁক নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসবে।

দেশে প্রথম দফা নির্বাচনের সপ্তাহ খানেক আগে দিল্লির শাহি ইমামও নির্বাচনের আগে নিয়ম করে যেমনটা করে থাকেন তেমন করে দেশের আপামর মুসলমান ভাই-বোনেদের জানিয়ে দিয়েছেন কোথায় কোন দলকে দিতে হবে ভোট। কোন দল সত্যিকারের মুসলমান দরদি তা নিজেই ঠিক করে ধর্মীয় নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন বুখারি সাহেব। এই নির্দেশ কতটা কাজে লাগে তা নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে কিন্তু এটাকে মেনে নিলে নির্বাচনকে প্রভাবমুক্ত বলা যাবে কি?

পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার জন্য বলেছেন ইমাম সাহেব। আর এই বলার জন্য সারা বছর কম 'পি আর' করতে হয়নি তৃণমূল কংগ্রেসকে। সারা বছর যোগাযোগ রাখা, পরামর্শ দেওয়া এবং নেওয়া এসব তো আছেই। মাস কয়েক আগেই ইমামের পরিবারে একটি বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল। যেতে পারেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দলের এক প্রথম সারির নেতাকে। পরে সুযোগ পেতেই নিজে দিল্লী গিয়ে উপহার-টুপহার দিয়ে এসেছেন। তার মানে ইমামের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখাটাই সংখ্যালঘু উন্নয়ন। সত্যি নির্বাচন কমিশন, কী বিচিত্র এই দেশ!

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি রাজনৈতিক দলের প্রধান। তাঁর পক্ষে ভোটের জন্য এমন চাতুরী মেনে নেওয়াই যায়। মানে মেনে নিতে আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু যেখানে দেশের মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়াতে এত উদ্যোগ নির্বাচন কমিশনের, যখন 'না-পসন্দ' ভোটের অধিকার দিতে 'নোটা' চালু করা হয়েছে তখন ভোটারদের প্রভাবিত করার এমন ধর্মীয় নির্দেশ কি বন্ধ করা উচিত নয়?

এই নির্বাচনে যা হওয়ার তা তো হয়েই গেল। পরবর্তীকালে বিষয়টা ভেবে দেখবেন কী? যদি মনে করেন এটা ধর্মনিরপেক্ষতার নজির তবে সাম্প্রদায়িক বিজেপি-কে বরখাস্ত করুন। কেড়ে নিন ভোটে লড়ার অধিকার।

— **সুন্দর মৌলিক**

‘ততো জয় মুদীরয়েৎ’

শ্রীচৈতন্য বর্ধন

নাঃ। নরেন্দ্র মোদীকে আর বুঝি ঠেকানো গেল না। CBI, SB, IB, SIT, RAW, High Court, Supreme Court এবং আরো নানা নামাঙ্কিত তদন্তকারী সংস্থার বেড়া দিয়ে মোদী বেটাকে আটকানো গেল না। সমস্ত চক্রান্ত জাল ছিন্ন করে বেটা সগর্বে বেরিয়ে আসছে। বুদ্ধিজীবী নামক কুকুরগুলির ঘেউ ঘেউ, ধর্মনিরপেক্ষ নামধারী ধর্মের ষাঁড়গুলি মোদীকে গুঁতোতে গিয়ে এখন শিং ভেঙে বাছুরের দলে ভিড়ে কাতরাচ্ছে। মোদীকে কুপোকাত করতে নানা রকম বেড়া দেবার চেষ্টা হয়েছে— কাঁটাতারের বেড়া, খেজুর কাঁটার বেড়া, মান্দার কাঠের বেড়া নামে কত ফ্রন্ট গড়া হলো, কিন্তু চোরাবালির বাঁধের মতো সেসব বেড়া টপকে মোদী বেটা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসছে। দেখে ফ্রন্টবিলাসীদের গা জ্বলে যাচ্ছে। ওদিকে এসব কোস্তাকোস্তি, ধস্তাধস্তির খরচ যারা জোগাচ্ছে তাদের কাছেও মুখ রক্ষা হচ্ছে না। সোনিয়ার শ্বেত পদাম্বুজে মাথা মুড়িয়েও যে কোনো ফায়দা হবে তারও কোনো আভাস পাওয়া যাচ্ছে না।

এদিকে পঞ্জীকারগুলোও যেন মোদী-ফ্যান হয়ে উঠেছে। গণকঠাকুরগণ বাড়ি বাড়ি গিয়ে আসন্ন নববর্ষের শুভাশুভ ফল ব্যাখ্যা করে বেড়াচ্ছে। ১৪২১ বঙ্গাব্দে নরেন্দ্র মোদীই যে কেল্লাফতে করতে চলেছে পঞ্জিকায় নাকি সে পূর্বাভাসই পাওয়া যাচ্ছে। যেমন :

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্

দেবীং সরস্বতীং চৈব ততো জয় মুদীরয়েৎ।।

এ ভবিষ্যদ্বাণী শুনে সেকুলার শকুনিগুলির মাথায় হাত, শিরে বজ্রাঘাত। তাদের যেন দুই পক্ষেই পক্ষাঘাত হয়েছে। রাজনৈতিক আকাশে ঘুরে বেড়াবার মতো সুখের দিন বুঝি শেষ হয়ে গেল। হাঃ মা সীতারাম! শেষ পর্যন্ত এই ছিল তোমার নসীবে! করাত যে এমন দু'দিকে কাটবে তা তো জানা ছিল না। বড়ো ভাগীদারের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে ছোট শরিকরা এখন মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসছে। কোনো হম্বিতম্বিই আর খাটছে না। গোদা পায়ের লাথির ভয়ে কেউ কাবু নয়। সবাই বুঝে গেছে কংগ্রেসী খুঁটি আলগা হতেই যে যার নিজের বাঁচার গর্ত খুঁজছে।

এসব পরগাছা দলগুলির এখন একমাত্র শ্লোগান কংগ্রেস বাঁচাও : দেশ বাঁচাও। চুলোয় যাক সাম্যবাদ, উচ্ছন্নে যাক বিশ্বশান্তি বিশ্বমৈত্রী, বরবাদ হোক ভারত-রুশ, ভারত-চীন, ভারত-পাক সমঝোতা। বিপদকালে কেউ বাঁচাতে আসবে না। এখন একমাত্র বাঁচার পথ সেকুলারবাদ। কিন্তু যেভাবে হিন্দু জাতীয়তাবাদ চারদিকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে তাতে ইসলামাবাদপন্থীদের কালঘাম ছুটছে। এককালে হিন্দুরা মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে কলমা মুখস্থ করতো— বর্তমানে সেকুলারবাদীরা নাকি গোপনে সূর্য প্রণাম ও দশমহাবিদ্যাস্তব পড়তে শুরু করছে। কিন্তু দীর্ঘদিনের অনভ্যাসবশত ‘কালীতারা মহাবিদ্যা’ বলতে গিয়ে ‘আলাতাল্লা মহম্মদ’ বলে ফেলছেন! কিন্তু ভয় নেই। হতাশ হবার কারণ নেই। মরা মরা বলতে বলতেই একদিন ঠিক রামনাম বেরিয়ে আসবে : সব সেকুলার বিষ জিহ্বা থেকে মুছে গিয়ে ঠিক : জয়রাম-শ্রীরাম নাদে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠবে। বাবা বিশ্বনাথের আশীর্বাদে কাশীধামেই কমল প্রস্ফুটিত হবে নিঃসন্দেহ।

বাংলা নববর্ষে সংস্কার ভারতীর সাংস্কৃতিক দেওয়ালপঞ্জী

‘বাংলার দেবদেউল’

বিকাশ ভট্টাচার্য

গবেষকদের মতে বাংলাদেশের মন্দির রচনার ইতিহাস দেড় হাজার বছরেরও বেশি। মুসলমান আক্রমণের পরে অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বর্ধমানের কয়েকটি জায়গায় ছাড়া অন্য কোথাও মন্দির বিশেষ একটা নির্মিত হয়নি। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে নবতর আন্দোলনের উন্মেষ দেখা গেল। সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিরাই স্থায়ী কীর্তি স্থাপনের আকাঙ্ক্ষায় মন্দির, অতিথিশালা, পথঘাট নির্মাণ করতেন। শিল্পকর্মের উপকরণ হিসেবে মাটির ব্যবহার ভারতবর্ষে সুদীর্ঘকালের সন্দেহ নেই, কিন্তু বাংলাদেশের মতো পোড়ামাটি-শিল্পের ব্যাপক প্রচলন আর কোথাও ছিল না।

প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও সংস্কার ভারতী তাদের সাংস্কৃতিক দেওয়ালপঞ্জী প্রকাশ করেছে। এ বছরের বিষয় ‘বাংলার দেবদেউল’। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় হাজার হাজার মন্দির স্ব-মহিমায় বিরাজমান। এরই সামান্য কয়েকটির ছবি ও তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রচেষ্টা কখনই সামগ্রিক নয়। প্রতিনিধিত্বমূলক তো নয়ই। আমাদের ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে তুলে ধরতেই এই প্রয়াস। অবশ্যই এই উদ্যোগ পরিশ্রমসাপেক্ষ। বহু প্রাচীন মন্দিরের ছবি এখানে তুলে ধরা হয়েছে। তার সঙ্গে মন্দির নির্মাণের তথ্যাদিও আছে।

পুরাণের কালে রাঢ়ভূমি বীরভূমের নলহাটিতে সতীর দেহাংশ ‘নলা’ পড়েছিল। দেবীর পতিত অঙ্গ ‘নলা’ থেকে নলাটেশ্বরী এখন লোকমুখে দেবী ললাটেশ্বরী। অনুসন্ধানে জানা যায় পীঠস্থানটি ২৫১ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ৮৪৪ খৃস্টাব্দে প্রথম আবিষ্কৃত হয়। আজকের যে দেবীমন্দিরটি দৃশ্যমান যেটি প্রতিষ্ঠা করেন নাটোরের রানি ভবানী। কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য, নলহাটির ললাটেশ্বরীর টিলায় পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব আধিকারিকের সমীক্ষায় ১৯৬৪ সালে এখান থেকে প্রাচীন, মধ্য ও শেষ প্রস্তর যুগের নানা ধরনের পাথরের অস্ত্র পাওয়া যায়। যার কিছু নিদর্শন কলকাতার মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

ভারতবর্ষীয় একান্ন পীঠের অন্যতম বক্রেশ্বর। তীর্থক্ষেত্রটির পূর্ব ও উত্তরে বক্রেশ্বর নদী, মন্দিরের দক্ষিণে বেশ কয়েকটি উষ্ণ প্রস্রবণ আর মূল মন্দিরটি ঘিরে বহুসংখ্যক শিবমন্দির রয়েছে। শ্বেতগঙ্গা কুণ্ডের উত্তর-পূর্ব কোণে এক বিশাল বট গাছের তলায় কিছু পাথরের ভাঙ্গা মূর্তি দৃশ্যমান। মূল মন্দিরটি ওড়িশার স্থাপত্যশৈলী অনুসারে নির্মিত রেখ-দেউল। তথ্যানুসারে আজকের মন্দিরটি প্রায় সাতশো বছরের প্রাচীন।

পশ্চিম মেদিনীপুরের চপলেশ্বর মন্দির।

রাজা নরসিংহদেব নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে কালাপাহাড়ের হাতে মন্দিরের একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে রাজা দর্পনারায়ণ ১৭৬১ খৃস্টাব্দে এটির সংস্কার করেন।

এই ধরনের নানান তথ্যে ভরপুর এই দেওয়ালপঞ্জী। পশ্চিমমেদিনীপুরের ডেবরা চণ্ডীপুরে অবস্থিত চপলেশ্বর জিউয়ের মন্দির। কথিত আছে, এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন গুজরাটের শোলাঙ্কি রাজপুত দ্বিতীয় কর্ণ বা দেবনাথ। ১২৯৭ খৃস্টাব্দে দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি গুজরাট আক্রমণ করলে পরাজিত শোলাঙ্কিরাজ পালিয়ে

পুরীতে আশ্রয় নেন। এখানেই দেবাদিদেব মহাদেবের স্বপ্নাদেশ পেয়ে জাজপুর হয়ে কেদারচণ্ডীপুরে আসেন। এখানে গভীর খাদে সিদ্ধকুণ্ডে বসে আছেন মহাদেব। ভুড়ভুড় শব্দে জল উঠছে। গভীর খাদে নেমে মহাদেবের পূজা করা অসম্ভব। তাই উঁচু, এলাকায় শোলাঙ্কিরাজ দেবনাথ প্রতিষ্ঠা করেন এই মন্দির। তবে সুপ্রাচীন এই মন্দিরটি এখন ধ্বংসের মুখে।

জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্সের বিখ্যাত শৈবতীর্থ জল্পেশ্বর শিবমন্দির। এখনকার রাজা জল্পেশ শিকারের পথে ১ শতকে আবিষ্কার করেন জলমগ্ন ভূগর্ভস্থ এই অনাদি শিবলিঙ্গ। প্রাচীন মন্দিরটি আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত। কুচবিহারের রাজা নরনারায়ণ ১৫৬৩-তে এবং পরে রাজা প্রাণনারায়ণ ১৬৬৩-তে মন্দিরটি সংস্কার করেন। মন্দিরের গঠনশৈলী বিশেষত গোলাকার গম্বুজটি মুসলমান স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন।

কলকাতার কাছেই ব্যান্ডেল থেকে চার কিলোমিটার দূরে অতীতের বন্দর-নগরী সপ্তগ্রাম আজকের বাঁশবেড়িয়া। ১৭৮৮ খৃস্টাব্দে বাঁশবেড়ের রাজা নৃসিংহদেবের হাতে শুরু হয়ে ১৮১৪-য় ছোটরানি শঙ্করীর হাতে সম্পূর্ণ হয় কালীমাতা দেবী হংসেশ্বরী মন্দির। এর গঠনশৈলী আশেপাশের মন্দির থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এতে আছে ১৩টি মিনার বা রত্ন। এর পাথর এসেছে চুনার থেকে। কারিগর জয়পুরের। দেবী এখানে নিমকাঠে তৈরি নীলরঙা চতুর্ভুজা।

বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী মন্দির।

হুগলী জেলার আঁটপুরের খ্যাতি মূলত ১৭৮৬-৮৭ খৃস্টাব্দে বর্ধমানরাজের দেওয়ান কৃষ্ণরাম মিত্রের গঙ্গাজল, গঙ্গামাটি আর ইটে গাঁথা ১০০ ফুট উঁচু রাধাগোবিন্দ জিউ-এর মন্দিরের জন্য। এই মন্দিরের টেরাকোটার কাজ অতুলনীয়। অদূরেই স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভাই স্বামী প্রেমানন্দ অর্থাৎ বাবুরাম ঘোষেদের দুর্গাবাড়ি। এই বাড়িতেই ১৮৮৬ খৃস্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপাধন্য নয়জন যুবক অর্থাৎ নরেন্দ্রনাথ, বাবুরাম, শরৎ, শশী, তারক, কালী, নিরঞ্জন, সারদা ও গঙ্গাধর প্রজ্বলিত ধুনির লেলিহান শিখাকে সাক্ষী রেখে জগতের কল্যাণের উদ্দেশ্যে সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প নেন।

২০ ইঞ্চি × ১৫ ইঞ্চি সাইজের ১২ পৃষ্ঠার এই ক্যালেন্ডার বহুবর্ণের এবং আর্টপেপারে ছাপা। মোট ২৪টি প্রাচীন মন্দিরের ছবি ও কৌতূহল জাগানো তথ্য। সেইসঙ্গে আছে বৈশাখ থেকে চৈত্র পর্যন্ত প্রত্যেক মাসের নানান ব্রত-পার্বণের বিবরণ।

সংস্কার ভারতীর এই সাংস্কৃতিক দেওয়ালপঞ্জী সর্ব অর্থেই সংগ্রহ করার মতন। নতুন বছর আসার আগে কলকাতায় রামমোহন লাইব্রেরি হলে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে এর লোকার্পণ হয়। দেওয়ালপঞ্জীটির প্রকৃত মূল্য বেশি হলেও আগ্রহীজনেরা কলকাতায় কেশবভবনে ও সংস্কার ভারতীর চর্চাকেন্দ্র মানিকতলার ৫০, বলদেওপাড়া রোডে প্রতিদিন সন্ধ্যায় মাত্র চল্লিশ টাকার বিনিময়ে পাবেন—একথা জানানো হয় সংস্থার পক্ষে।

মুর্শিদাবাদের কিরীটেশ্বরী মন্দির।